বাংলাপিডিএফ
দস্যু বনহুর
২৩-২৪
দুই খন্ড একত্রে
আফ্রিকার জঙ্গলে দস্যু বনহুর
বাংলাদেশে দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ
রনি
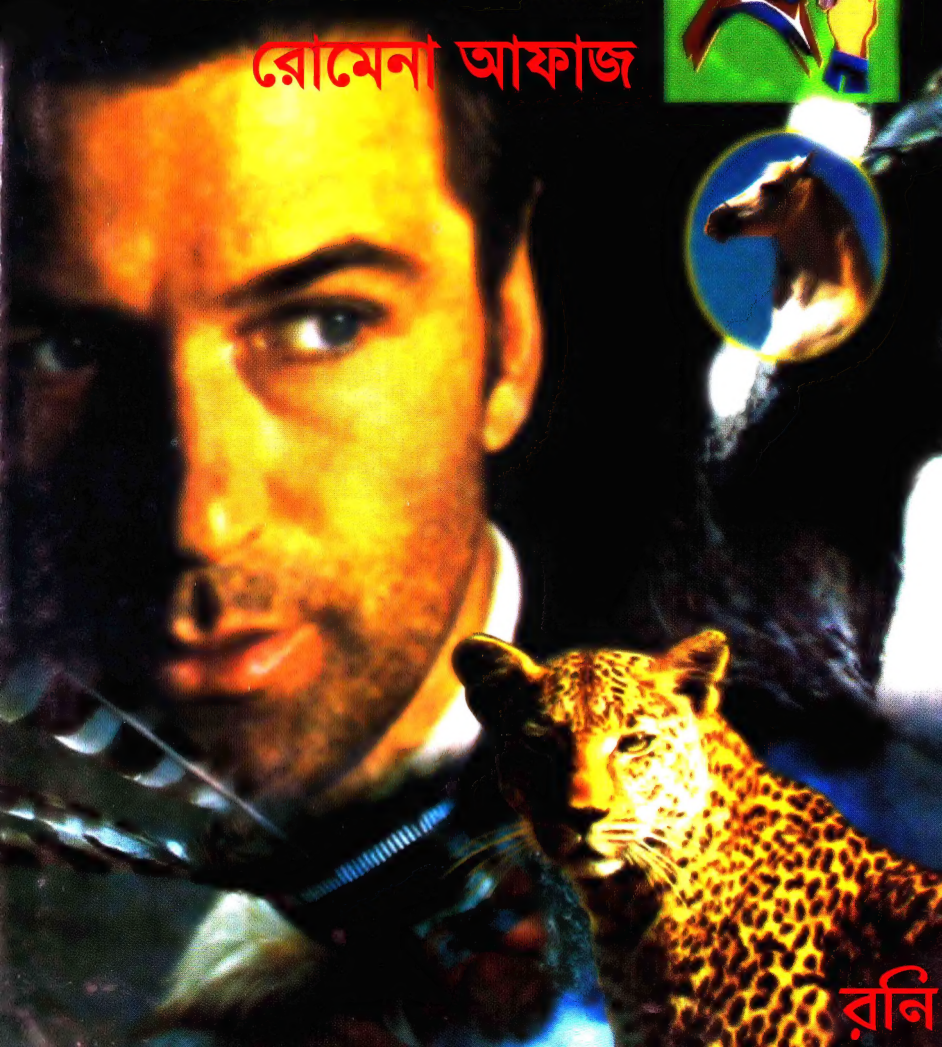
ঐই সিরিজের পরবর্তী বই
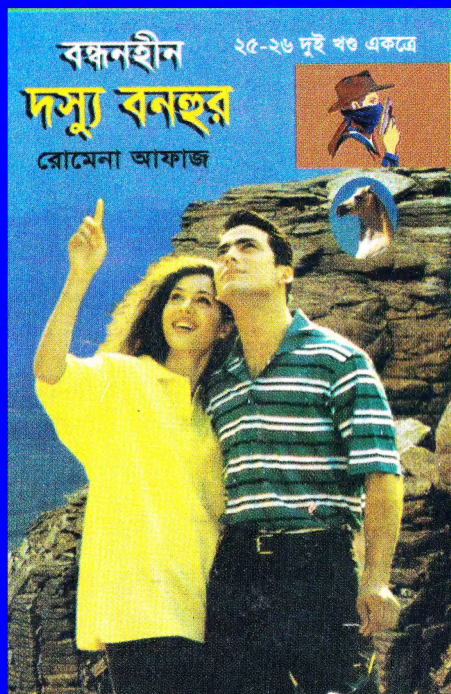
আফ্রিকার জঙ্গলে দস্যু বনহুর-২৩
বাংলাদেশে দস্যু বনহুর-২৪

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং

মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি, কে, দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑
মীরা থ' মেরে গেছে, কি আনন্দে অধীর হবে তা নয়, আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। আশ্চর্য নয়নে তাকাচ্ছে ওদের দু'জনার মুখে।

কিন্তু প্রদীপ কুমার আর নিশ্চুপ থাকতে পারলো না। ছুটে গেলো সে, আবেগ ভরা কণ্ঠে ডাকলো— মীরা!

মীরা কোনো জবাব দিতে পারেনা, সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনহুর শান্ত-মিষ্টি কণ্ঠে বলে—মীরা, তোমার সম্মুখে যে দাঁড়িয়ে, সে-ই তোমার আসল প্রদীপ কুমার; আর আমি নকল। আমার পরিচয় জানতে পারবে তোমার প্রদীপের মুখে। মীরা, আর্শীবাদ করি, তোমরা সুখী হও-- কথা শেষ করেই পাশের মুক্ত জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো দস্যু বনহুর।

মীরার মুখে কোনো কথা নেই, সে তাকিয়ে আছে যে পথে প্রদীপ কুমার অদৃশ্য হয়েছে।

প্রদীপ কুমার মীরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললো— মীরা, যে চলে গেলো সে তোমার প্রদীপ নয়----

কে তবে?

বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর!

হাঁ মীরা, এতোদিন দস্যু বনহুর নাম শুনলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করতাম কিন্তু আজ আমার অন্তর ভরে তাকে শ্রদ্ধা করি। দস্যু বনহুর শুধু আমার রক্ষক নয়— আমার প্রাণদাতা।

মীরা অবাক হয়ে প্রদীপের কথাগুলো শুনছিলো, বললো এবার— প্রদীপ, তুমি রাতের অন্ধকারে আমাকে না বলে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলে?

আমি রাতের অন্ধকারে কোথাও যাইনি বা পালাইনি। যাকে তোমরা প্রদীপ বলে এতোদিন আঁকড়ে ধরে রেখেছিলে সে আমি নই -দস্যু বনহুর।

তুমি নও?

না।

কিন্তু?

আমি সব শুনেছি। দস্যু বনহুর আমাকে সব বলেছে। মীরা, তুমি পবিত্র, তুমি নিষ্পাপ----- নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে প্রদীপ মীরাকে।

মীরা প্রদীপের বাহুবন্ধনে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। অসীম আনন্দে আপ্লুত হয়ে যায় ওরা।

❑

জাহাজের ডেকে রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুর। চোখে তার পুরু কালো চশমা, ঠোঁটের ফাঁকে ধূমায়িত সিগারেট। আনমনে তাকিয়ে আছে সে সম্মুখের সীমাহীন জলরাশির দিকে।

বনহুর কান্দাই এর পথে ফিরে চলেছে।

আগের চেয়ে আজ তার মন অনেকটা হাল্কা। মন্থনার রাজ কুমার প্রদীপকে সদ্য-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে সে, এ আনন্দ তার কম নয়। প্রদীপ কুমারকেও শুধু সে মৃত্যুর কবল থেকেই রক্ষা করেনি, মীরার পাশে তাকে ফিরিয়ে এনে দিতে পেরেছে। বনহুরের হাসি পেলো— শেষ পর্যন্ত তাকে বিচারকের ভূমিকাও পালন করতে হলো। কিন্তু সবচেয়ে বনহুর বেশি আশ্চর্য হয়েছে প্রদীপের সঙ্গে তার নিজের চেহারার হুবহু মিল দেখে। মীরার কি অপরাধ আর তার নিজেরই বা দোষ কি! মীরা তাকে সচ্ছ মন নিয়ে গ্রহণ করেছিলো, নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলো তার প্রদীপের মধ্যে। বনহুর নিজেও জানতোনা তার নিজের পরিচয়। মীরার ভালবাসা তাকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিলো। মীরার সান্নিধ্য তার সমস্ত হৃদয়কে করে ফেলেছিলো আচ্ছাদিত। নিজের অজান্তে বনহুর কখন যে মীরাকে ভালবেসে ফেলেছিলো, নিজেই বুঝতে পারেনি। কিন্তু বনহুর সংযত রেখেছিলো নিজেকে, মীরার পবিত্রতা সে নষ্ট করেনি কোনোদিন। আজ মীরা ফিরে পেয়েছে তার আসল প্রদীপ কুমারকে, আর বনহুর সরে এসেছে দূরে। ---- কিন্তু মনের কোণে একটা ব্যথার ছোঁয়া খচ্ খচ্ করছিলো তার।

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারায় ব্যাঘাত ঘটলো, সুমিষ্ট একটি কণ্ঠস্বর— আপনি কোথায় যাবেন?

ফিরে তাকালো বনহুর, কালো চশমার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। একটু আশ্চর্য হলো সে। সুন্দরী একটি যুবতী তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। এক নজরে দেখে নিলো বনহুর যুবতীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। আধুনিক সাজে সজ্জিত যুবতী, হাতে কুমীরের চামড়ার ভ্যানিটী। পায়ে লম্বা হিলওয়ালা লেডিস সু। খোঁপাটা মাথার উপরে উঁচু করে বাঁধা। চোখে কাজলের রেখা, ললাটে কুমকুমের টিপ্। সরু দু'খানা ঠোঁটে পুরু করে লিপ্‌ষ্টিক্ লাগানো। গাড়ির রঙ বনহুরের চোখে ধরা পড়লো না কারণ তার চোখে সবই গভীর নীলাভ দেখাচ্ছে। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো বনহুর— কান্দাই যাবো।

মেয়েটি যেন খুশি হলো বনহুরের কথায়, বললো— যাক, ভালই হলো, শেষ অবধি আপনি আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। আমরাও কান্দাই যাবো।

বনহুর যুবতীর সচ্ছভাব লক্ষ্য করে একটু অবাক হলো। সাধারণতঃ বাঙালী মেয়েরা হঠাৎ কোনো পুরুষের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে পারেনা। বনহুর হস্তস্থিত সিগারেটটা সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

যুবতী আবার বললো— আমার আব্বা কান্দাই পুলিশ বিভাগে কাজ করেন। আমমি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মন্থনা দ্বীপে মামা বাড়ি বেড়াতে এসেছিলাম। আমার মামাও মন্থনার পুলিশ ইন্সপেক্টার।

কালো চশমার আড়ালে দস্যু বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো বিপুল আগ্রহে। একটু হেসে বললো বনহুর— কান্দাই যাচ্ছেন, বেশতো। আমিও পুলিশ বিভাগে কাজ করি, আপনার আব্বার নামটা জানতে পারলে হয়তো চিনতে------

আপনিও পুলিশের লোক, যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম। আমার আব্বার নাম বললে নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবেন— পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরী।

বনহুর হো হো করে হেসে উঠলো— মিঃ জাফরীর কন্যা আপনি! তিনি আমার অত্যন্ত বন্ধু লোক।

সত্যি, আপনাকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে আর কোনো দুশ্চিন্তা রইলো না।

কেন, দুশ্চিন্তা কিসের?

আপনি পুলিশ বিভাগে কাজ করেন অথচ বলছেন দুশ্চিন্তা কিসের? দস্যু বনহুরের অত্যাচারে দেশের কোনো শান্তি আছে নাকি? এই যে জাহাজে চলেছি, সব সময় মনে হচ্ছে— কখন না জানি দস্যু বনহুর------

হামলা করে বসে, তাই না? যুবতীর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললো বনহুর।

এমন সময় একটি পনেরো-ষোল বছরের বালক দূর থেকে যুবতীটিকে দেখতে পেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে— বড় আপা, ওখানে কি করছো?

যুবতী হাত তুলে ডাকে— চলে আয় মঞ্জুর।

বনহুর সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে।

মঞ্জুর একরকম প্রায় ছুটেই আসে— তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে খুঁজে ফিরছি সমস্ত জাহাজময়। আচ্ছা মেয়ে তুমি, একটু যদি ভয় থাকতো তোমার হৃদয়ে।

কেনরে— কিসের ভয়?

দস্যু বনহুরের।

দস্যু বনহুর--- দস্যু বনহুর, বলি এ জাহাজে সে আসবে কি করতে! শোন্ ভয় পাবার কিছু নেই; ইনিও পুলিশের লোক— আমাদের সঙ্গেই কান্দাই পর্যন্ত যাবেন, তাছাড়া আব্বার বন্ধু-জন।

বালকটি হাস্যউজ্জ্বল মুখে তাকালো বনহুরের দিকে, আদাব দিয়ে বললো— যাহোক, আপামনিকে ধন্যবাদ, এতোবড় জাহাজটায় বেছে বেছে পুলিশের লোককে আবিষ্কার করে নিতে পেরেছেন।

বনহুর বালকটিকে লক্ষ্য করে বললো— তোমার নাম মঞ্জুর, ওর মুখে ডাক শুনেই জেনে নিতে সক্ষম হয়েছি। এবার বলোতো মঞ্জুর, তোমার আপামনির নামটা কি?

ও ঃ, এতোক্ষণ শুধু আলাপই হচ্ছিলো, আসল ব্যাপারটা এখনও বাকী আছে। হাঁ শুনুন, আমার আপামনির নাম মিস সুইটি। বড্ড মিষ্টি কিন্তু আমার আপামনি, দেখবেন আবার খেয়ে ফেলবেন না যেন।

বনহুর ছেলেটির কথা-বার্তায় বুঝতে পারলো, যেমন সুচতুর বাবা তেমনি তাঁর সন্তান। হাসলো বনহুর— তোমার আপা যেমন মিষ্টি, তুমি কিন্তু তেমনি টক্-----

এক সঙ্গে ওরা তিনজন হেসে উঠলো।

প্রথম পরিচয়েই এতো—অল্পসময়ের মধ্যেই মিস সুইটি ও মঞ্জুরের সঙ্গে দস্যু বনহুরের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেলো।

সুইটি বললো— যদিও বয়সে আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বড় তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, মনে কিছু করবেন না নিশ্চয়ই?

মোটেই করবোনা, বলুন? বললো বনহুর।

আপনার নামটা-------

ওঃ বলতে ভুলেই গেছি— তোমরা জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই আমার বলা উচিৎ ছিলো। আমার নাম আলমগীর চৌধুরী।

হাঁ, আমি আব্বার মুখে আপনার নাম অনেক বার শুনেছি। বিজ্ঞের মত বললো মঞ্জুর, সত্যিই যেন সে তার পিতার মুখে এ নাম অনেক বার শুনেছে।

মিঃ আলমগীর চৌধুরীকে পেয়ে মিস সুইটি ও মঞ্জুর খুশি হলো অনেক। যাহোক একটা ভরসা পেলো ওরা মনে। পুলিশের লোক জেনে সাহসটা ওদের দশগুণ বেড়ে গেছে।

বনহুরের অবস্থাও তাই— সে অবশ্য ভয়ে নয়, এই বিরাট জাহাজটায় প্রায় এক সপ্তাহকাল নিঃসঙ্গ একা কাটাতে হতো, একদিনেই মনটা কেমন হাঁপিয়ে উঠেছিলো— মিস সুইটি আর মঞ্জুরকে পেয়ে ভালো হলো, তবু গল্পে-সল্পে সময় কাটবে।

বনহুর প্রথমেই যুবতীর কথা-বার্তায় আশ্চর্য হয়েছিলো, কারণ যুবতী তার সঙ্গে যেভাবে আলাপ করছে তাতে মনে হচ্ছে সে যেন তার কত পরিচিত।

এবার বনহুরকে আরও অবাক করে দিয়ে বললো মিস সুইটি— আজ আমাদের ক্যাবিনে আপনার চায়ের দাওয়াত রইলো।

বনহুর প্রথমে আপত্তি তুলতে যাচ্ছিলো কিন্তু মঞ্জুর বনহুরের হাত চেপে ধরলো— আপনাকে ছাড়ছিনে।

বিপদে ফেললে দেখছি তোমরা । বরং আমার ক্যাবিনে তোমাদের দু'জনার দাওয়াত রইলো, বয়কে বলে দিচ্ছি।

হেসে বললো মঞ্জুর— বয়ের হাতে চা খাওয়ার চেয়ে আমার আপামনির হাতে একবার টেষ্ট করে দেখবেন। একবার যদি খান তবে আবার আপনা-আপনি দাওয়াত চেয়ে নেবেন।

তাই নাকি! বেশ, দাওয়াত কবুল করলাম। কিন্তু এখন নয়, বিকেলে।

কারণ? বললো মঞ্জুর।

বনহুর এতোটুকু বালকের কাছেও কথায় যেন টিকে উঠতে পারছিলোনা, মৃদু হেসে বললো— চা নাস্তা পর্ব শেষ করে তবেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

তখনকার মত আর বেশি কথাবার্তা হলোনা, বনহুর ওদের দুটি ভাই-বোনের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো নিজ ক্যাবিনে।

ক্যাবিনেও কোনো কাজ নেই।

অলস দেহটা ক্যাবিনের সোফায় এলিয়ে দিয়ে টেবিল থেকে পত্রিকাখানা হাতে তুলে নিলো বনহুর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখতে লাগলো পাতাগুলো নেড়েচেড়ে। হঠাৎ মীরা ও প্রদীপের ছবিতে নজর পড়তেই চমকে উঠলো সে। দৃষ্টি তার স্থির হলো—নীচে লেখা রয়েছে—

মন্থনার রাজ কুমার প্রদীপ গত
রাতে মন্থনায় ফিরে এসেছেন।
আগামী পূর্ণিমায় প্রদীপ কুমারের
সঙ্গে মীরা দেবীর বিয়ে সুসম্পন্ন হবে।

বনহুর ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায়, প্রদীপ ফিরে পেলো তার মীরাকে, মীরা পেলো প্রদীপকে-- আর বনহুর কি কোনোদিন ফিরে পাবে তার বনকন্যা নূরীকে! মৃত্যুর অসীমে যে বিলীন হয়ে গেছে, আর কি কোনোদিন পাবে সে তার সন্ধান! কোনোদিন বনহুর আর নূরীকে ফিরে পাবেনা। হাতের পত্রিকাখানা টেবিলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ক্যাবিনের মুক্ত গবাক্ষে এসে দাঁড়ালো, সেখান থেকে সম্পূর্ণ সাগরবক্ষ দেখা যাচ্ছে। শুধু জল আর জল— এতোটুকু সবুজের চিহ্ন কোথাও নেই। এমন কি আকাশে কোনো উড়ন্ত পাখিও নজরে পড়ছেনা, কারণ সাগরবক্ষ থেকে তীর কত দূরে কে জানে।

বনহুর পিছনে হাত রেখে উদাস দৃষ্টি মেলে গভীরভাবে নূরীর কথা স্মরণ করছিলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ফিরে তাকাতেই, বয় টেবিলে কফি রেখে গেলো।

বনহুর আবার ফিরে এসে টেবিলের পাশে সোফায় বসে পড়লো, বড় নিঃসঙ্গ একা লাগছে। খেয়ালী বনহুরের এমন নিশ্চুপতা বড় অসহ্যনীয়। সময়গুলো যেন আর কাটতে চায়না।

বনহুর সবেমাত্র কফির পেয়ালা হাতে তুলে নিয়েছে—ঠিক ঐ মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো মঞ্জুর; পিছনে মিস সুইটি। মঞ্জুরের হস্তে একখানা পত্রিকা।

মিস সুইটি ও মঞ্জুর ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই বনহুর অনুমানে বুঝতে পারলো—পত্রিকায় প্রদীপের ছবি দেখে ওরা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে। বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ব্যাপার কি?

মঞ্জুর পত্রিকাখানা মেলে ধরলো বনহুরের সম্মুখে— আপনি আমাদের মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন। আপনি মন্থনার রাজকুমার প্রদীপ।

মিস সুইটি বললো—পাশের মেয়েটি বুঝি আপনার মীরা?

বনহুর হেসে বললো— প্রদীপের সঙ্গে আমার চেহারার হুবহু মিল আছে বটে, কিন্তু আমি মন্থনার রাজকুমার নই।

আপনার চেহারাটা কিন্তু রাজকুমারের মতই দেখতে।

মঞ্জুরের কথায় বললো বনহুর—তাই নাকি?

সত্যি! কথাটা বললো সুইটি।

হাসলো বনহুর।

এ-কথা সে-কথার পর বিদায় গ্রহণ করলো মঞ্জুর আর সুইটি।

বনহুরও উঠে পড়লো— দ্বিপ্রহরের গোসলটা সেরে নিতে হবে।

মিস সুইটি আর মঞ্জুর চলে যাবার সময় আবার স্মরণ করিয়ে দিলো—বিকেলে চা-পর্বটা তাদের ওখানে সারতে হবে।

❑

চায়ের টেবিলে বনহুর, মঞ্জুর আর সুইটি চা পান করতে করতে হাসি-গল্পে মেতে উঠেছে।

পাশের টেবিলে ট্র্যানজিস্টার রেডিও একটি ইংলিশ গান পরিবেশন করছিলো।

সুইটি নিজ হস্তে চা বানিয়েছে—এ নিয়েই গল্প হচ্ছিলো। প্রথম প্রথম একবার নাকি সে তার আব্বার কয়েকজন বন্ধুকে চা তৈরি করে

খাওয়াচ্ছিলো। আব্বা খুব প্রশংসা করছিলেন সুইটির, ওর হাতে চা নাকি অমৃতের চেয়েও সুস্বাদু। সুইটি পিতার মুখে নিজ প্রশংসা শুনে গর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিলো। খুশি মনে চা তৈরি করছিলো সে ।

বয় ভুল করে চিনির পাত্রটা না এনে এনেছে লবণের বোয়াম। অবশ্য বয়ের কোনো দোষ ছিলোনা, কারণ সুইটির আম্মা কাশ্মীর গিয়ে দুটো কাশ্মীরী পট এনেছিলেন একই রকম দেখতে। সুন্দর পাত্র দুটি—তিনি একটিতে চিনি অপরটিতে লবণ ব্যবহার করতেন। বয় যে সেদিন চিনির পাত্র ভেবে লবণের পাত্রটা এনে হাজির করবে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। সুইটি খুব আনন্দিত মনে চায়ে চিনির পরিবর্তে লবণ মিশিয়ে এগিয়ে দিয়েছিলো তার আব্বার বন্ধুদের সামনে। আর পরের কাহিনী বলতে গিয়ে মিস সুইটি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিলো, এবার শুরু করলো মঞ্জুর— আব্বার বন্ধুগণ খুশি হয়ে মিস সুইটি রাণীর তৈরি চা পান করতে গিয়ে যেমন এক চুমুক মুখে দিয়েছেন—অমনি হা— প্রত্যেক জনই থু-থু করে মুখের চা মেঝের গালিচায় ঢেলে ফেললো। আব্বা তো একেবারে থ' মেরে গেছেন, ব্যাপার কি!--------

আবার একটা হাসির হুল্লোড় উঠলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে রেডিওতে ঘোষণা শুরু হলো, মন্থনা দ্বীপ থেকে যে জাহাজ কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছে, সেই জাহাজে ফিরে যাচ্ছে দস্যু বনহুর। যাত্রীদের সবাইকে সাবধান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সরকার। সম্মুখে আরাকান বন্দরে পুলিশ ফোর্স অপেক্ষা করছে। বনহুর এবার ধরা পড়তে বাধ্য হবে---

ঘোষণাটা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখোভাব পরিবর্তন হলো।

মিস সুইটি আর মঞ্জুরের মুখ কালো হয়ে উঠলো। মুহূর্তে ওদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। সুইটি ভীতভাবে বললো —সর্বনাশ! যে ভয় করেছিলাম, সেই ভয়ই গ্রাস করলো।

মঞ্জুর প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে বললো— মিঃ চৌধুরী, আপনি কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারবেন না। এখানেই থাকতে হবে আপনাকে।

বনহুর বললো— ভয় কি, তোমাদের সঙ্গে পুলিশ তো রয়েছে, আর রয়েছে তাদের রাইফেল।

তবু ভয় হচ্ছে। সত্যি বলতে কি, দস্যু বনহুর যখন এই জাহাজে আছে তখন আর কারো রক্ষা নেই।

বনহুর একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো— কেন, সে বাঘ না ভল্লুক? সেও তো মানুষ— তোমার আমার মতই একজন।

হোক সে মানুষ কিন্তু সে সাধারণ মানুষের মত নয়। সে কাউকে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

তা হয় তো করে না, তাই বলে নিরপরাধ কোনো ব্যক্তিকে সে হত্যা করতে যাবে কেন?

সুইটি ধরে বসলো— তাদের ক্যাবিনেই থাকতে হবে আলমগীর সাহেবকে; বিশেষ করে মঞ্জুরের বিছানায় শুতে হবে তাকে।

তখনকার মত থাকবো বলে কথা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো বনহুর।

কিন্তু ক্যাবিনে ফিরে সে পায়চারী শুরু করলো, পুলিশ কি করে সন্ধান পেলো। তাহলে কি প্রদীপ জানিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা? না, সে কিছুতেই একথা কাউকে জানাবে না প্রদীপ প্রাণ রক্ষা পেয়েছে তার জন্য। তবে কি মীরা বলেছে ভাবীস্বামীর মুখে তার পরিচয় জানতে পেরে? বিশ্বাস কি, মীরাই হয়তো ভুল করে কাউকে ব্যাপারটা বলে ফেলেছে। তাই হবে— না হলে মন্থনার কোনো প্রাণী জানে না একথা।

বনহুরের চিন্তাধারা একেবারে অমূলক নয়, মীরাই কথাটা বলেছিলো তার এক বান্ধবীর কাছে। মীরা জানতো না— তার বান্ধবী কোনো এক গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারের ভগ্নী।

ভগ্নীর মুখে এই রহস্যপূর্ণ কাহিনী শুনে গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারেননি, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন মন্থনার পুলিশ অফিসে সব কথা।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মহল জানতে পেরেছে—যে জাহাজখানা গত প্রভাতে মন্থনা বন্দর ত্যাগ করে কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছে— সে জাহাজেই দস্যু বনহুর মন্থনার রাজকুমার প্রদীপকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে এবং তৎক্ষণাৎ রেডিও-খবরে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে সমস্ত দেশ হতে দেশান্তরে। এমন কি সর্বপ্রথম জাহাজখানা যে বন্দরে নোঙ্গর করবে, সেই আরাকান বন্দরেও জানানো হয়েছে সংবাদটা ওয়্যারলেসে।

মীরা জানতো না ব্যাপারটা এতোদূর গড়াবে। "দেওয়ালেরও কান আছে" কথাটা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করে মীরা, কেন সে ভাল ভেবে কথাটা বলেছিলো তার বান্ধবীর কাছে? কেন সে এতোবড় একটা ভুল করেছিলো? দস্যু বনহুর তার কত বড় মঙ্গল সাধন করেছে, আর তারই কিনা সর্বনাশ হবে! মন্থনায় বসে ভাবে মীরা তার নকল প্রদীপের কথা------- নিশ্চয়ই সে এখন ফিরে যাচ্ছে, হয়তো বা রেডিও-সংবাদ তার কানেও পৌঁছে গেছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কি ভয়ঙ্কর, কি অশোভনীয় ব্যাপার! মীরা নিজের ভুলের জন্য বিদগ্ধ হয়।

❑

মীরা যখন তার নকল প্রদীপকে নিয়ে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে, তখন 'মডেল' জাহাজের একটি ক্যাবিনে দস্যু বনহুর পায়চারী করছে আর ভাবছে আরাকানে জাহাজ পৌঁছবার পূর্বে তাকে গা ঢাকা দিতে হবে। কিন্তু জাহাজে অবস্থান করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। আরাকান পুলিশ সমস্ত জাহাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে, তাছাড়া তাকে সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে কান্দাই থেকে হয়তো কয়েকজন বিশিষ্ট পুলিশ-বন্ধু প্লেনযোগে এসে হাজির হয়েছেন, তাঁরা তাকে সাদর অভিনন্দন জানাবার জন্য আরাকান বন্দরে পুষ্পমাল্যের পরিবর্তে লৌহ-শিকল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কাজেই আরাকান পর্যন্ত এ জাহাজে টিকে থাকা আর কিছুতেই সম্ভব হবে না।

বনহুর সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললো। তাদের জাহাজ 'মডেল' এখন আফ্রিকা জঙ্গলের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আরাকানে পৌঁছতে এখন এক রাত্রি ও একটি দিন লাগবে। আজ রাতেই তাকে সরে পড়তে হবে জাহাজ থেকে। বনহুর মনে মনে স্থির করে নিলো, এবার তার ভাগ্য পরীক্ষা হবে আফ্রিকার জঙ্গলে। তাদের জাহাজ এখন সম্পূর্ণ আফ্রিকার জঙ্গল এরিয়ার পাশ দিয়ে চলেছে।

সমস্ত জাহাজময় একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, দস্যু বনহুর এ জাহাজেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যাত্রীদের মধ্যে একটা ভীতিকর ভাব জেগে উঠেছে। সবাই কেমন যেন নিশ্চুপ বনে গেছে, ভালোয় ভালোয় আরাকানে পৌঁছতে পারলে হয়।

যতই বেলা শেষ হয়ে আসতে লাগলো ততই জাহাজে একটা ভীতিভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। সবার হৃদয় দুরু দুরু করে কাঁপছে। না জানি রাতের অন্ধকারে দস্যু বনহুর কার না কার উপর হামলা করে বসবে।

'মডেলে' বিভিন্ন জাতীয় যাত্রি ছিলো—সবাই নিজ নিজ স্বজাতীর সঙ্গে একত্র হয়ে নিজেদের অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে রইলো।

মিস সুইটি ও মঞ্জুর ধরে বসলো বনহুরকে, তাদের ওখানে রাত্রে থাকতেই হবে।

বনহুর শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়ে পারলো না।

গভীর রাত।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, পাশে মঞ্জুর ঘুমাচ্ছে; ওদিকের শয্যায় মিস সুইটি নিদ্রায় মগ্ন। দস্যু বনহুরের ভয়ে দুটি ভাই-বোন কুঁকড়ে গেছে যেন। মায়া হলো বনহুরের, সত্যি ওরা বড় অসহায়। ইচ্ছা করলে মিঃ

জাফরীর প্রতিশোধ নিতে পারে সে এই দু'টি তরুণ-তরুণীর উপর। কিন্তু সে এতো বড় নিঃসংশয় হৃদয়হীন নয়। দস্যু বনহুর কোনো দিন অসহায়ের প্রতি অবিচার করে না।

বনহুর অতি সন্তর্পণে মিস সুইটির বিছানার দিকে অগ্রসর হলো। তাকিয়ে আছে সে তার ঘুমন্ত মুখের দিকে। হঠাৎ টি-পয়ে ধাক্কা লেগে এ্যাসট্রেটা পড়ে গেলো মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেংগে গেলো মিস সুইটি ও মঞ্জুরের। মঞ্জুর ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো— মিঃ আলমগীর সাহেব, উঠুন উঠুন, দস্যু বনহুর এসেছে, দস্যু বনহুর এসেছে!

মিস সুইটি আর্তনাদ করে উঠলো—মিঃ চৌধুরী---- উঠুন----- উঠুন-

বনহুর সুইচ্ টিপে আলো জ্বাললো।

মিস সুইটি বলে উঠলো— আপনি!

হাঁ, আমি দেখছিলাম বাইরে কাউকে, মানে দস্যু বনহুরকে দেখা যায় কিনা। কারণ বাইরে কারো পদশব্দ আমি শুনতে পেয়েছি।

সর্বনাশ, ভাগ্যিস আপনি জেগেছিলেন, নাহলে দস্যু বনহুর আমাদের সব লুট করে নিতো। জিনিসপত্র নিক ক্ষতি নেই কিন্তু আমার যত ভয় আপামনির জন্য ----

কেন? দস্যু বনহুর তোমার আপামনির কি ক্ষতি করবে বা করতে পারে?

মিঃ আলমগীর সাহেব, আপনি জানেন না, দস্যু বনহুর যদি কোনো মেয়েকে দেখে, তাকে যেমন করে হোক চুরি করে তবে ক্ষান্ত হয়।

এ কথা কে বললো তোমাকে? দস্যু বনহুর মেয়ে দেখলেই তাকে চুরি করে নিয়ে যায়?

আব্বার মুখে আমরা শুনেছি। বললো মিস সুইটি।

তাই নাকি! তাহলে এই জাহাজে দস্যু বনহুর আছে তবুও আপনি এখনও দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন, কই সে তো আপনাকে কোনো রকম উপদ্রব করছেনা?

মঞ্জুর বলে উঠলো— আপনি দেখছি পুলিশের লোক হয়েও দস্যু বনহুরের সম্বন্ধে গুড্ আইডিয়া পোষণ করেন।

না করে যে পারিনে, সত্যিই দস্যু বনহুর অতোখানি হৃদয়হীন নয়। যাক, আপনারা শুয়ে পড়ুন, আমি যতক্ষণ রয়েছি, দস্যু বনহুর আপনাদের কিছু করতে পারবেনা।

বনহুর শয্যায় এসে শুয়ে পড়লো।

রাত বেড়ে আসছে।

জাহাজের একটানা ঝক্ ঝক্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছেনা। সমস্ত জাহাজ নীরব—নিস্তব্ধ।

জাহাজের সার্চলাইট সম্মুখে আলো নিক্ষেপ করে বিরাট জলজন্তুর মত সাগরবক্ষ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো।

সবাই নিদ্রায় মগ্ন।

কয়েকজন পাহারাদার গুলীভরা রাইফেল নিয়ে সজাগ পাহারা দিচ্ছিলো।

বনহুর বেরিয়ে আসে ক্যাবিন থেকে, ব্যস্তভাবে এগিয়ে যায় পাহারাদারগণের দিকে।

পাহারাদারগণ জানে, ইনি পুলিশের লোক। তাই বনহুরকে দেখামাত্র সেলুট করে দাঁড়ায়।

বনহুর বললো— দেখো, তোমরা সবাই সম্মুখ-ডেকে গিয়ে সর্তক দৃষ্টি রাখে, সামনের তিন নম্বর ক্যাবিনে যে ভদ্রলোক থাকেন তাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। এ জাহাজে আসার পর তার গতিবিধি আমার ভাল মনে হয়নি।

পাহারাদারদের একজন বললো— স্যার, তিন নম্বর ক্যাবিনে পুলিশ ডাক্তার কিবরিয়া থাকেন।

হাঁ, ঐ ভদ্রলোকটির কথাই বলছি, তিনি যে সত্যি ডক্টর কিবরিয়া—তা নও হতে পারেন। দস্যু বনহুরের চাতুরী বোঝা মুস্কিল, কিবরিয়ার ছদ্মবেশে সেই হয়তো আত্মগোপন করে আছে। তোমরা এই ক্যাবিনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আমি নিজে পিছন ডেকে নজর রাখছি। কথ শেষ করে বনহুর দ্রুত চলে যায় পিছন ডেকের দিকে।

পাহারাদারগণ বনহুরের কথামত রাইফেল বাগিয়ে ধরে ডক্টর কিবরিয়ার ক্যাবিন পাহারা দিতে লাগলো।

বনহুর পিছন ডেকে গিয়ে দাঁড়ালো, চারদিকে একবার দেখে নিয়ে ডেকের রেলিং এ ঝুলানো একটি মোটর-বোটের রশি খুলে কৌশলে একাই সে নামিয়ে ফেললো সাগরবক্ষে।

এ সব বোট বিপদকালের জন্য সর্বক্ষণ জাহাজের পিছন ডেকে মজুত করে রাখা হয়ে থাকে।

চলন্ত জাহাজের পিছন অংশে উচ্ছল ঢেউএর বুকে বোটটা যেন আছাড় খাচ্ছিলো। বনহুর টর্চের আলো ফেলে বোটটা একবার ভাল করে দেখে নিলো, তারপর অতি কৌশলে রশি বেয়ে নামতে লাগলো নীচে। হঠাৎ যদি হাতটা ফস্কে যায় তাহলেই ছিটকে গিয়ে পড়বে একেবারে সাগরবক্ষে, তখন রক্ষা থাকবেনা আর। অথৈ জলরাশির বুকে কতক্ষণ সাঁতার কেটে

টিকে থাকতে পারবে। হয়তো বা কোনো ভয়ঙ্কর জীবজন্তু নিমিষে তাকে গ্রাস করে ফেলবে।

জাহাজের পিছনে জলরাশি ভীষণভাবে আলোড়িত হচ্ছিলো। দুদিক থেকে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছিলো মোটর-বোটখানার গায়ে। তরঙ্গের বুকে একটা কুটার মত দুলছিলো বোটখানা। বনহুর রশি বেয়ে অতি সাবধানে নেমে আসছিলো জাহাজ থেকে মোটর-বোটটার দিকে।

থর থর করে কাঁপছে রশিটা। কারণ রশির একটা দিক বাঁধা রয়েছে মোটর-বোটখানার সঙ্গে; অপরদিক রয়েছে জাহাজের রেলিং এ।

বনহুর যখন ঠিক্ মোটর-বোটখানার অতি নিকটে পৌঁছে গেছে তখন হঠাৎ তার একখানা হাত খসে গেলো রশি থেকে। শিউরে উঠলো বনহুর কিন্তু তার ভাগ্য ভাল বলতে হবে, একেবারে রশি থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো সে মোটর-বোটখানার মধ্যে।

বনহুরকে নিয়ে বোটখানা তরঙ্গের বুকে প্রচণ্ডভাবে আছাড় খেতে লাগলো। নিজেকে সামলে নিতে বেশিক্ষণ লাগলো না বনহুরের। বোটের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, যদিও তার পা থেকে সমস্ত শরীর ভীষণভাবে দুলছে।

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা বের করে নিলো। সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা, অতি সাবধানে কেটে ফেললো রশিটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুরপাক খেয়ে মোটর-বোটখানা জাহাজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে সরে গেলো। বনহুর তাকিয়ে দেখলো—তাদের জাহাজ 'মডেল' বহুদূরে অন্ধকার একটা কালো পাহাড়ের মত লাগছে। মজবুত হস্তে মোটর-বোটের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলো বনহুর।

জাহাজে মোটর-বোটগুলো সর্বক্ষণের জন্য তৈরিই থাকে। কাজেই কোনো অসুবিধা হলোনা। বনহুর মোটর-বোটে এবার ষ্টার্ট দিয়ে চালু করে নিলো।

জাহাজের ঝক ঝক শব্দে মোটর-বোটের শব্দ ক্ষীণ শোনালো। বনহুর জাহাজের বিপরীত দিকে মোটর-বোটের মুখ ফিরিয়ে নিলো।

জাহাজের আলো বনহুরের চোখে মোহময় মনে হলো। ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে জাহাজখানা। বনহুর ভাবছে— ঐ জাহাজের একটি ক্যাবিনে এখনও ঘুমিয়ে রয়েছে মিস সুইটি আর মঞ্জুর। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে আর তারা খুঁজে পাবেনা তাদের আলমগীর সাহেবকে! ওরা যাতে ওকে ভুল না বোঝে তাই বনহুর একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছে সুইটির বালিশের নীচে। বনহুর লিখেছে—

"মিস সুইটি,
সত্যিকারের আলমগীর
সাহেব আমি নই। আপনারা যাকে
ভয় করেছিলেন, যার ভয়ে আলমগীর
সাহেবকে আপনাদের রক্ষক হিসাবে
গ্রহণ করেছিলেন, আমি সেই লোক।
আপনার পিতা মিঃ জাফরীকে আমার
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন।
শেষ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকতে
পারলাম না, সেজন্য দুঃখিত।"
আপনাদের শুভাকাঙ্খী

দস্যু বনহুর

ঐ চিঠিখানা রাখতে গিয়েই বনহুরের পায়ে আঘাত লেগে টেবিল থেকে এ্যাসট্রেটা পড়ে গিয়েছিলো, তখনই জেগে উঠেছিলো মিস সুইটি আর মঞ্জুর। চিঠিখানা তখন না রাখতে পারলেও অন্যবার সে সফলকাম হয়েছিলো।

বনহুর ভাবে--- মিস সুইটি জেগে উঠে তার সন্ধান করবে। হয়তো বেশ ঘাবড়ে যাবে কিছু সময়ের জন্য। জাহাজে তাকে নিয়ে একটা আলোড়ন শুরু হবে, কিন্তু যখন তার চিঠিখানা পাবে তখন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। হয়তো আঁতকে শিউরে উঠবে—তাদের ক্যাবিনেই রাত যাপন করেছে স্বয়ং দস্যু বনহুর!

কিন্তু ঐ সব চিন্তা করার সময় এখন বনহুরের নেই। ফিরে আসে সে নিজের উপস্থিত পরিবেশে। এখন সে মাঝ-সমুদ্রে, বাঁচতে হলে তাকে সংগ্রাম করতে হবে।

মোটর-বোটখানা এখন কোন্ দিকে চলেছে কে জানে। হয়তো বা তীরের দিকে নয়— তীর ছেড়ে আরও মাঝ-সাগরে। বোটের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে বসে আছে বনহুর। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না। এতোক্ষণ তবু জাহাজের আলোটার একটা ক্ষীণ রশ্মি তার দৃষ্টি শক্তিকে আকর্ষণ করছিলো, এবার জাহাজখানা সম্পূর্ণ দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছে।

বনহুর তাকিয়ে আছে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে। সাগরবক্ষ শান্ত হলেও একেবারে নীরব নয়। উচ্ছ্বল জলরাশি গর্জন করে ছুটে চলেছে কোন্ অজানার পথে। বনহুর মোটর-বোটের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে নিশ্চুপ বসে রইলো। যতক্ষণ না ভোরের আলো ফুটেছে ততক্ষণ তাকে ধৈর্য ধরে বসে

থাকতেই হবে। কিন্তু বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করে ঘাবড়ে গেলো। তীর যদি সীমানার মধ্যে না হয় তাহলে মস্ত বিপদ, সূর্যের জ্বালাময় তীব্র আলো সহ্য করাই হবে মুস্কিল। ক্ষুধা সহ্য করা তার অভ্যাস আছে। যত কষ্ট হোক নীরবে বহন করতে পারবে, কিন্তু প্রখর সূর্যের তাপ কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে সে!

যত চিন্তাই করুক বনহুর তাকে নিয়ে বোটখানা, দিকহারা ভাবে একদিকে ছুটে চললো।

বনহুর যখন জাহাজ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে তখন সে পরিচ্ছদের নীচে তার দস্যুবেশ লুকিয়ে রেখেছিলো। সূতীক্ষ্ণ-ধার ছোরা, রিভলভার, কিছু গুলী নিয়েছিলো সে চোরা পকেটে। বনহুর জানতো এ অঞ্চল অতি ভয়ঙ্কর স্থান, তাই সে বিপদ মুহূর্তেও কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়েছিলো সঙ্গে।

এক সময় পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। এতোক্ষণে বনহুর দিক নির্ণয় করে নিতে সক্ষম হলো। ভালভাবে সাগরবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো। শুধু জল আর জল, তীরের কোনো চিহ্ন নেই। বনহুর বোট থামিয়ে ফেললো, কোন্ দিকে যাবে সে। কোন্ দিকে এগুলো তীরের দিকে যেতে পারবে কে জানে।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখতে লাগলো। আকাশে কোনো পাখিটি পর্যন্ত নজরে পড়লোনা। বনহুর বুঝতে পারলো— একশত মাইলের মধ্যে তীরের কোনো চিহ্ন নেই।

বনহুর আবার ষ্টার্ট দিলো তার মোটর-বোটে। যা ভাগ্যে থাকে হবে, চুপ থাকার জন সে নয়। যতক্ষণ বোটের ইঞ্জিনে শক্তি আছে ততক্ষণ তীরের সন্ধানে ছুটবে সে!

কিন্তু বনহুর সমস্ত দিন অবিরাম বোট চালিয়েও তীরের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলোনা। আকাশে আজ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের আনাগোনা থাকায় সূর্যের তাপ তেমন প্রখর ছিলোনা, কাজেই খুব কষ্ট তার হয়নি এখনও। তবে ক্ষুধার জ্বালা তাকে বেশ চঞ্চল করে তুলেছিলো— গোটা একটা দিন কেটে গেছে, মুখে কুটো যায়নি। পিপাসায় জিহ্বা শুকিয়ে আসছে, যদিও সে প্রচুর জলরাশির বুকে ভাসছে তবুও এক ফোঁটা জল মুখে দিবার জো নেই, বিষময় লবণাক্ত জল।

বনহুর ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে, তার দুঃসাহসী প্রাণ আশঙ্কায় দুলে উঠছে, আরও ক'দিন সে তীরের সন্ধান পাবে না তাই বা কে জানে।

সমস্ত দিন কেটে গেলো, মোটর বোটের ষ্টার্ট ধীরে ধীরে কমে আসছে, কারণ পেট্রোল নিঃশেষ হয়ে এসেছে। বনহুর এবার গভীর চিন্তায় পড়লো।

সাগরবক্ষে সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেধে আসছে। আজ দু'দিন এতোটুকু ঘুমায়নি সে, বনহুরের চোখ দু'টো ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো।

পেট্রোল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় মোটর-বোটখানা অচল হয়ে পড়েছে। সাগরের ঢেউ-এর টানে আপন মনে ভেসে চলেছে এক দিকে। বনহুর এবার গা থেকে সার্টটা খুলে মাথার নীচে রেখে শুয়ে পড়লো মোটর-বোটের মেঝেতে, পা দুখানা রাখলো বোটের আসনে।

ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা, কালো সামিয়ানায় জরির বুটিগুলো যেন চক্ চক্ করছে।

সাগরবক্ষ আজ স্থির!

ঝিরঝিরে বাতাসে দোল খেয়ে খেয়ে বোটখানা ভেসে চলেছে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে বনহুর, দুদিনের অনিদ্রায় শরীরটা তার ক্লান্তি আর অবসাদে ভরে উঠেছিলো, শোবার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাদেবী আশ্রয় নিয়েছিলো তার আঁখিদ্বয়ে।

এমন চিন্তাহীন মনে কতদিন বনহুর ঘুমায়নি। আজ সে পরম নিশ্চিন্ত। বাতাসে কোঁকড়ানো চুলগুলো উড়ছে। সুন্দর মুখমণ্ডলে নেই কোনো দুঃচিন্তা বা ক্লান্তির ছাপ। বলিষ্ঠ বাহু দুটি বুকের উপর রয়েছে। বুট পরা পা দুখানা তখনও তোলা হয়েছে বোটের আসনে।

❑

এক নিদ্রায় রাত ভোর হয়ে যায়।

সূর্যের আলো চোখে লাগতেই উঠে বসলো বনহুর। একি, তার বোটখানা আর নড়ছে বলে মনে হলোনা! বনহুর ধড়ফড় উঠে দাঁড়ালো, অবাক হয়ে দেখলো— একটা ছোট্ট গোলাকার দ্বীপের সঙ্গে তার বোটখানা আটকে গেছে।

আশায়-আনন্দে বনহুরের মনটা নেচে উঠলো। তাহলে এবার মাটির সন্ধান পাওয়া গেলো যা হোক। বনহুর খুশি হয়ে বোট থেকে এক লাফে নেমে পড়লো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট দ্বীপটা দুলে উঠলো যেন। বনহুর ভাল করে লক্ষ্য করবার পূর্বেই দ্বীপটা চলতে শুধু করলো, তারপর আস্তে করে তলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পুনরায় লাফিয়ে উঠে বসলো নিজের মোটর-বোটখানায়। আর একটু হলেই হয়েছিলো আর কি, বনহুরের বোটখানা যে ছোট্ট দ্বীপটায় আটকে পড়েছিলো আদতে সেটা কোনো দ্বীপ বা ঐ ধরনের কিছু নয়—একটা বিরাট কচ্ছপ, তারই পিঠের উপর সে লাফিয়ে নেমে দাঁড়িয়েছিলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো— বিরাট কচ্ছপটা ধীরে ধীরে ডুবে গেলো সাগরের নোনা জলে!

বনহুরের বোট তখন ভেসে চলতে শুরু করেছে।

আজকের দিনটাও বনহুরের এ ভাবেই কেটে চললো। প্রখর সূর্যের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো বনহুর। ক্ষুধা-পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে আছে। বনহুর ভেবে পায়না আর— কতক্ষণ এ ভাবে জীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে সে।

❑

সমস্ত জাহাজে সাড়া পড়ে গেলো, মিঃ আলমগীর সাহেব গেলেন কোথায়! জাহাজের ক্যাপ্টেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন? সকলেরই ধারণা দস্যু বনহুর তাকে কৌশলে জাহাজ থেকে উধাও করেনি তো। পুলিশ ডাক্তার কিবরিয়ার উপর কড়া নজর রেখেছে পাহারাদারগণ।

বিশেষ করে মিস সুইটি আর মঞ্জুর ঘাবড়ে গেলো। ভদ্রলোক তাদের কক্ষেই ছিলো সে রাতে এবং তাদের অনুরোধেই ছিলো। হঠাৎ আলমগীর সাহেবের অন্তর্ধানে একেবারে মুষড়ে পড়লো তারা। মঞ্জুর তো প্রায় কেঁদেই ফেললো, কারণ অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন আলমগীর সাহেব, তাছাড়া তিনি একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার।

গোটা জাহাজ অনুসন্ধান চালানো হলো, জাহাজের প্রত্যেকটা জায়গা তন্ন তন্ন করে দেখা হলো— আলমগীর সাহেবের কোন খোঁজই পাওয়া গেলোনা।

সম্পূর্ণ দুটো দিন পর তাদের জাহাজ 'মডেল' আরাকান বন্দরে পৌঁছে গেলো।

বন্দরে সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেন ও আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

জাহাজ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাহাজটা পুলিশ ফোর্স ঘিরে ফেললো। মিঃ জাফরী সর্বপ্রথম পুত্র-কন্যার মঙ্গল সংবাদের জন্য ছুটে গেলেন জাহাজে। দস্যু বনহুর তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করেছে কিনা এই তার সন্দেহ। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন তার পুত্র এবং কন্যা সুস্থ্য ভাবে জাহাজে অবস্থান করছে তখন তিনি আশ্বস্ত হলেন।

মিস সুইটি এবং সকলের মুখে এক আশ্চর্য খবর তিনি জানতে পারলেন--- পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আলমগীর সাহেব নাকি এ জাহাজে আসছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে তিনি কোথায় জাহাজ থেকে উধাও হয়ে গেছেন। মিঃ জাফরী কথা শুনে অবাক হলেন— কারণ আলমগীর সাহেবকে তিনি সশরীরে কান্দাই পুলিশ অফিসে রেখে এসেছেন।

মিস সুইটি আরও জানালো— আব্বা, মিঃ আলমগীর সাহেব বড় মহৎ এবং ভাল লোক। তিনি সব সময় আমাদের খোঁজ-খবর রাখতেন। আমাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেজন্য তার সতর্ক দৃষ্টি ছিলো। যেদিন রাতে তিনি নিখোঁজ হয়েছেন, সেদিন দস্যু বনহুরের ভয়ে তাকে আমাদের ক্যাবিনেই রেখেছিলাম কিন্তু ভোরে উঠে দেখি তিনি নেই।

মিঃ জাফরী আরও অবাক হলেন যখন ডক্টর কিবরিয়ার ক্যাবিনে গিয়ে দেখলেন, পাহারাদারগণ তাঁকে কড়া পাহারায় রেখেছে, এমনকি ডক্টর কিবরিয়াকে বাইরে পর্যন্ত বের হতে দিচ্ছেনা তারা। মিঃ জাফরীকে দেখে তিনি প্রায় কেঁদে ফেললেন— তিনি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পুলিশ হসপিটালে সার্জনের কাজ করছেন, কোনো দিন এমন অপদস্থ হননি আর আজ কিনা বৃদ্ধ বয়সে তিনি হলেন ছদ্মবেশী দস্যু বনহুর!

মিঃ জাফরী হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পাননা, পাহারাদারগণ এমনভাবে একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে নাজেহাল করে তুলেছে দেখে তিনি ভীষণ রেখে গেলেন।

কিন্তু কি করবেন— ওয়্যারলেস সংবাদে দস্যু বনহুর এ জাহাজে আছে জানতে পেরে জাহাজময় যখন একটা ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হয় তখন মিঃ আলমগীর তাদের এভাবে ডক্টর কিবরিয়ার উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেন, কারণ তাঁর গতিবিধি নাকি সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিলো।

মিঃ জাফরী সব শুনে গম্ভীর হলেন, তিনি বুঝতে পারলেন— ঐ মিঃ আলমগীরবেশি ব্যক্তিই দস্যু বনহুর। সে জাহাজের লোকের চোখে পুলিশ অফিসার বলে ধোকা দিয়ে নিজে আত্মগোপন করেছিলো এবং সুযোগ বুঝে অন্তর্ধান হয়েছে। মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেন সবার হয়ে ডক্টর কিবরিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

সমস্ত জাহাজ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালালেন পুলিশ বাহিনী, প্রতিটি ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হলো— কিন্তু দস্যু বনহুরকে পাওয়া গেলোনা।

মিস সুইটির বিছানা উঠাতে গিয়ে চাকর ছোকরা একটি ভাঁজ করা কাগজ হাতে ছুটে এলো— স্যার, আপামনির বিছানায় বালিশের তলায় এটা পেয়েছি।

মিঃ জাফরী চিঠিখানা হাতে নিয়েই বুঝতে পারলেন এ-চিঠি দস্যু বনহুরের ছাড়া কারো নয়। তারপর চিঠি পড়া শেষ করে তিনি আশ্বস্ত হলেন, তাঁর ধারনা অমূলক নয়। যার সন্ধানে প্লেনযোগে তারা আরাকানে এসে হাজির হয়েছেন— সে মাঝ সাগরে উধাও হয়েছে।

মিঃ জাফরী রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, দস্যু বনহুর তাঁকে বার বার এমনভাবে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে। শুধু তাকেই নয়, সমস্ত পুলিশ বাহিনী নাজেহাল হয়ে পড়েছে, দস্যু বনহুরকে কেউ আয়ত্বে আনতে পারছেনা।

দেশব্যাপী শুধু দস্যু বনহুর আর দস্যু বনহুর!

'মডেলে' যখন দস্যু বনহুরকে নিয়ে নানা রকম কথার আলোচনা চলছে তখন দস্যু বনহুর তার মোটর-বোটে সাগরবক্ষে ভেসে চলেছে, কোথায় কোন অজানার পথে— ।

বনহুর ক্ষুধার চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে প্রখর রৌদ্র যখন অগ্নি বর্ষণ করে । বনহুর শুধু পুরুষই নয়— সে লৌহমানুষ। তাই তার সুন্দর দেহ রাঙা হয়ে উঠলেও কালো হয়ে গেলোনা বা অবশ শিথীল হয়ে পড়লোনা।

তৃতীয় দিনে বনহুর দেখলো আকাশের দক্ষিণ কোণে জমাট কালো মেঘ ভেসে উঠেছে। বনহুর জানে এ মেঘ কত ভয়ঙ্কর! বিশেষ করে সাগরবক্ষে অতি মারাত্মক এ মেঘ। সাইক্লোন ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

বনহুর ভীত হলোনা, একটা আশা তার মনকে সবল করে তুললো। সাইক্লোন বা ঝড়-তুফান যা হয় হোক, তাহলে তার বোটখানা নিশ্চয়ই এ ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেনা। প্রচণ্ড ঝড়ে সাগরবক্ষে জাগবে ভীষণ ঢেউ, বনহুর মোটর-বোটের হাল যদি ঠিকভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে হয়তো কোন তীরের দিকে পৌঁছেও যেতে পারবে সে।

বনহুর যা ভেবেছিলো হলো তাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ ছেয়ে গেলো কালো মেঘে। বাতাস ভীষণ ঝড়ের আকার ধারণ করলো। সাগরবক্ষ ফেঁপে-ফুলে দশ হাত উঁচু হয়ে উঠলো। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউ তীরবেগে ছুটে এসে আছড়ে পড়তে লাগলো। বনহুর মোটর-বোটের হাল চেপে ধরে শক্ত হয়ে বসে রইলো দক্ষ মাঝির মত।

প্রবল ঝড়ের দাপটে এবার তীরবেগে বোটখানা ছুটতে লাগলো দিশেহারার মত।

সেকি ভীষণ ঝড়!

অবশ্য বনহুরের কাছে এ ঝড় নতুন নয়; সে আরও দু'বার সাগরবক্ষে সাইক্লোনের কবলে পড়েছিলো, কিন্তু এমনভাবে নয়; সে হলো জাহাজের উপর। আর আজ এ সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র একটি জলযানের উপর, বনহুর তবু এতোটুকু বিচলিত হলোনা।

ঝড়ের মধ্যেই শুরু হলো প্রবল বৃষ্টিপাত।

বনহুর ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর ছিলো, ঠাণ্ডা-শীতল বৃষ্টিধারা পান করার জন্য সে লালায়িত হয়ে উঠলো। হাতে নিয়ে বৃষ্টির জল পান করার কোনো উপায় ছিলোনা। কারণ বলিষ্ঠভাবে হাল ধরে সে বোটখানাকে বাঁচিয়ে নিচ্ছিলো। বনহুর আকাশের দিকে হা করে বৃষ্টিধারা পান করতে লাগলো।

এতো বিপদেও বনহুরের হাসি পেলো, চাতক পাখির মত আজ তার অবস্থা হয়েছে, কিন্তু এখন কোনো কথা ভাববার বা চিন্তা করবার সময় নেই। এতোটুকু ভুল হলেই তার বোট ঢেউ-এর তলায় নিমর্জ্জিত হবে।

সেকি ভীষণ অবস্থা। সাগরবক্ষ যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পাগলা হাতীর মত ঢেউগুলো ছুটছে এদিক থেকে সেদিকে। বনহুরের শরীরে ঝড়ের ঝাপ্টা তীরবেগে এসে লাগছে। দুর্বল কোন মানুষ হলে কখন কুটোর মত উড়ে যেতো কোথায় কে জানে।

বনহুর জীবনে বহু প্রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

হাঙ্গর কুমীরের সঙ্গেও সে লড়াই করেছে, বাঘ-ভল্লুক-সিংহ শাবক ছিলো তার ছোটবেলার খেলার সাথী। কত হিংস্র জীবজন্তু যে বনহুরের হাতে জীবন দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আজ বনহুর লড়াই করে চলেছে ঝড়ের সঙ্গে, ঝড় নয় প্রচণ্ড সাইক্লোনের সঙ্গে। বনহুর দেখতে চায় কে জয়ী হয়—সে না সাইক্লোন। যত ঝড়ের বেগ বাড়তে থাকে, ততই বনহুর তটস্থ হয়ে উঠে। প্রচণ্ডবেগে প্রকাণ্ড ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে বনহুরের দেহে। কিন্তু অতি কৌশলে বনহুর তার মোটর বোটখানাকে বাঁচিয়ে নিতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো বনহুর।

ভয়ঙ্কর সাইক্লোন তার বোটখানাকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হলোনা। এক সময় ধীরে ধীরে ঝড়ের দাপট কমে এলো। আকাশও সচ্ছ হয়ে এলো অনেক। সাগরের উন্মত্ততাও কমে এলো আস্তে আস্তে। এবার বনহুর আশ্বস্ত হলো, যাক্ এ যাত্রা সে পরিত্রাণ পেলো।

বনহুর ভিজে কাপড়-চোপড় ভাল করে নিংড়ে আবার পড়ে নিলো, কিছুক্ষণ পূর্বে সেই আকাশ-বাতাসের রূপ সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। কে বলবে এ প্রকৃতি একটু আগে কি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিলো। সচ্ছ আকাশ, সাগরের প্রচণ্ড ঢেউগুলো এখন শান্ত ছেলের মতই নীরব নিশ্চুপ হয়ে পড়েছে।

বনহুর পূর্বের চেয়ে এখন অনেক সুস্থ্য বোধ করছে। ক'দিন তার গোসল ছিলোনা, শরীরটা জ্বালা করছিলো ভীষণভাবে। এখন আর শরীরে তেমন কোন জ্বালাময় ভাব নেই। আংগুল দিয়ে বনহুর চুলগুলো আঁচড়ানোর মত করে নিলো।

কিছু সময়ের মধ্যে তার শরীরের ভিজে জামা কাপড়গুলো শুকিয়ে এলো। বনহুর এবার তার ক্লান্ত অবশ দেহটা এলিয়ে দিলো মোটর-বোটের আসনে।

সিগারেট আর নেই—নিঃশেষ হয়ে গেছে কবে। খাবার না পেলো তবু যদি এ সময় সিগারেট পেতো দু'চারটে তাহলেও এতোটা খারাপ লাগতোনা তার।

আপন মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে বনহুর—এমন সময় হঠাৎ পাখি দেখতে পেলো আকাশে উড়ছে। তড়িৎ গতিতে বনহুর উঠে বসলো,

ভাল করে লক্ষ্য করতেই আনন্দে আপ্লুত হলো। পাখিটি সাধারণ একটি মাছরাঙা পাখি। বনহুর বুঝতে পারলো—তার বোটখানা তীরের অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে। নাহলে এমন ছোট পাখি আকাশে উড়তে দেখা যেতোনা।

যা ভেবেছিলো বনহুর, ভালভাবে তাকাতেই সে দেখলো—পশ্চিম দিকে কালো রেখার মত কিছু নজরে পড়ছে। বোটের মধ্যে ছোট্ট একটি বৈঠা ছিলো, বনহুর সেই বৈঠা হাতে তুলে নিয়ে পানি টানতে শুরু করলো।

জানে বনহুর— সামান্য বৈঠার টানে এই বিশাল সাগরবক্ষে অগ্রসর হওয়া কতটুকু সম্ভব। তবু সে আপ্রাণ চেষ্টায় পানি টানতে আরম্ভ করলো।

বনহুরের অসাধ্য বুঝি কিছু নেই, সে বেশ কয়েক ঘন্টার অবিরাম পরিশ্রমের পর তীরের সন্নিকটে আসতে সক্ষম হলো। সেকি ভয়ঙ্কর জঙ্গল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি জমাট বেঁধে যেন দাঁড়িয়ে আছে সাগর তীরের সন্নিকটে। বনহুরের দৃষ্টি সে জঙ্গলে প্রবেশে সক্ষম হলোনা। অদূরে নজর পড়তেই বনহুর অবাক হলো, এক দল হরিণ সাগরতীরে পানি পান করছে।

বনহুরের বোটখানা দেখতে পেয়ে ছুটে পালালো হরিণদল। একটি ছোট্ট হরিণ শিশু তখনও পালাতে সক্ষম হয়নি, সকলের পিছনে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিলো। বনহুর সেই হরিণশিশু লক্ষ্য করে রিভলভার উঁচু করে ধরলো, কিন্তু পর মুহূর্তে নামিয়ে নিলো রিভলভারখানা। কি হবে ওটাকে হত্যা করে, সামান্য একটা হরিণশিশু! সঙ্গে ম্যাচবাক্স থাকলে তবু না হয় আগুন জ্বেলে ওটাকে উদরস্থ করা যেতো, কিন্তু সে রকম কোনো উপায় নেই।

বনহুর তার বোটখানা তীরে লাগিয়ে নেমে পড়লো। কিছুক্ষণের জন্য মৃত্তিকায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণভয়ে নিশ্বাস নিলো। ক'দিন অবিরত সাগরবক্ষে থাকায় মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করছিলো, বোটের দোলাটা যেন এখনও তার শরীরে দোল জাগাচ্ছিলো, বনহুর তার বোটখানা টেনে তুলে নিলো ডাঙ্গায়।

এবার সে তাকালো গহন বনের দিকে। ক্ষুধা-পিপাসায় বুকটা শুকিয়ে উঠেছে। অত্যন্ত শক্তিশালী বলেই বনহুর এখনও চলতে পারছে। কিন্তু আর বেশিক্ষণ এভাবে চলা তার সম্ভব হবে না।

বেলাও আর বেশি নেই।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি সাগরবক্ষে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে যেন। বনহুর আর বিলম্ব না করে গহন বনে প্রবেশ করলো। সেকি ভয়ঙ্কর ভীষণ বন, চারদিকে নানারকম বৃক্ষ লতাগুল্ম জমাট বেঁধে আছে। বনে প্রবেশ করতেই একটা গর্জন শুনতে পেলো সে, প্রকাণ্ড কোনো হিংস্র জন্তুর গর্জন।

বনহুর সচকিত হয়ে তাকালো, বনের মধ্যে বেলা শেষের অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হয়ে উঠেনি যদিও তবু বেশ ঝাপসা হয়ে এসেছিলো।

সম্মুখে তাকাতেই দেখতে পেলো—ঝাপসা অন্ধকারে দুটো আগুনের গোলা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। বনহুর মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো, প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে অগ্নিগোলাদ্বয় লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হুঁঙ্কার করে লাফিয়ে পড়লো একটি বিরাট ব্যাঘ্র। বনহুর নিমিষে সরে দাঁড়ালো, ব্যাঘ্রটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। তারপর আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিলোনা, কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। বারকয়েক একটা গোঁ গোঁ শব্দ করে নীরব হয়ে গেলো ওর দেহটা।

বনহুর এগিয়ে এলো, ভাল ভাবে লক্ষ্য করে দেখলো বিরাট একটি চিতাবাঘ সে হত্যা করেছে। এমন বাঘ তার নজরে আজ পর্যন্ত খুব কমই পড়েছে, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকে দেখলো বনহুর বাঘটাকে। ভাগ্যিস্ তার নিকটে রিভলভার ছিলো, না হলে এই দণ্ডে তার মৃত্যু ঘটতো।

বনহুর দু'পা অগ্রসর হয়েছে অমনি একটা কিছু তার পায়ে জড়িয়ে ধরলো, চমকে উঠে পায়ের দিকে তাকাতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলো বনহুর—কালো মত কিছু একটা তার পা দুখানা জড়িয়ে ধরেছে। কি এটা! বনহুর আর চলতে পারছে না। নিশ্চয়ই কোনো জীব হবে। বনহুর ভাল ভাবে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো— জীবই বটে। একটা জোঁক তার পা দু'খানাকে লেপটে ধরেছে।

বনহুর বুঝতে পারলো—ওটা আফ্রিকার জঙ্গলের জোঁক। তার পায়ে ভারী বুট থাকায় জোঁকটা চাক্তি বসাতে পারছেনা। অনেক চেষ্টা করলো বনহুর কিন্তু জোঁকটাকে সে কিছুতেই পা থেকে সরিয়ে নিতে পারলোনা। এখন উপায়, বনহুর এবার তার কোমরের বেল্ট থেকে সুতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা খুলে নিলো, তারপর দ্রুতহস্তে জোঁকটাকে দুই খণ্ড করে ফেললো।

এবার তার পা দু'খানা মুক্ত হয়ে এলো। তাকালো বনহুর চারদিকে, অগ্রসর হবে কিনা ভাবছে। সে জানে, এটা কত বড় ভয়ঙ্কর মারাত্মক স্থান। পৃথিবীর সবচেয়ে সাংঘাতিক বন এই আফ্রিকার জঙ্গল। এ জঙ্গলে প্রবেশ করা মানে সানন্দে মৃত্যুকে বরণ করা।—কিন্তু উপায় কোথায়, পিছনে সীমাহীন সাগর আর সম্মুখে গহন বন। বনহুর এখন কোন্ দিকে যাবে, রিভলভারে মাত্র কয়েকটা গুলী এখনও জমা রয়েছে। কতক্ষণ ঐ গুলী কটি তাকে রক্ষা করবে, ভেবে পায়না সে।

ক্ষুধা-পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠেছে, নাড়ী-ভুড়ি হজম হবার জোগাড় প্রায়। বনহুর ক্লান্ত অবশ দেহটা টেনে নিয়ে আরও কিছুটা অগ্রসর হলো, হঠাৎ সম্মুখে কয়েকটা বেল ফল পড়ে থাকতে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। সুমিষ্ট বেলগুলো বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে, কতগুলো

দু'খণ্ড হওয়া। বনহুর দুটি বেল হাতে তুলে নিয়ে নাকে ধরলো। সুন্দর সুমিষ্ট গন্ধ—বেল দুটি হাতে করে বনহুর দ্রুত বেরিয়ে এলো বন থেকে।

সাগরতীরে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

সাগর-তরঙ্গের গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বনহুর একটা পাথর খণ্ডের উপরে চেপে বসে বেল দুটির একটি ভেঙ্গে ফেললো। তারপর পরম আনন্দে গো-গ্রাসে গলধঃকরণ করলো।

একটি বেল খেয়েই বনহুরের ক্ষুধা-পিপাসা লাঘব হয়ে গেলো। অন্যটি পাশে রেখে ভাবলো এবার একটু নিশ্চিন্ত জায়গায় প্রয়োজন, কিন্তু এখানে তেমন নিরাপদ স্থানের আশা—দুরাশা মাত্র। হিংস্র জীবজন্তু পরিপূর্ণ এ জঙ্গলে প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে অতীব ভয়ঙ্কর।

বনহুর ভাবলো, তার মোটর-বোটখানা আবার সাগরে ভাসিয়ে রাতের মত নিশ্চিন্ত হতে পারে, কিন্তু সাগরের ঢেউ-এর স্রোতে আবার যদি তাকে সাগর মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাহলে উপায় কি হবে!

রাতের মত তাকে আশ্রয় করে নিতেই হবে।

বনহুর এবার একটা বুদ্ধি আটলো মাথায়। তার মোটর-বোটখানা উঁচু করে নীচে যদি শুয়ে পড়ে তাহলে হয়তো নিশাচর হিংস্র জন্তুর কবল হতে রক্ষা পেলেও পেতে পারে। বনহুর এবার পাথর খণ্ডটার উপর থেকে নেমে এগিয়ে গেলো তার মোটর বোটটার পাশে। অল্পক্ষণের চেষ্টায় বোটখানা বনহুর উঁচু করে ফেললো, কিন্তু এখন ভিতরে প্রবেশের উপায় কি? বনহুর হতাশ হবার বান্দা নয়, বোটখানার পাশে বালির মধ্যে একটা গর্ত করে ফেললো—তারপর সেই সুড়ঙ্গ মুখ দিয়ে প্রবেশ করলো সে ভিতরে। যাক, রাতের মত আশ্রয় হলো তার।

পরম নিশ্চিন্ত মনে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর। ক'দিন তার দেহের উপর দিয়ে ভীষণ যুদ্ধ চলেছিলো, শুধু দেহেই নয় মনটাও দুশ্চিন্তায় ভরে ছিলো, কারণ সাগরবক্ষ থেকে তীরে পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ ছিলো তার।

বনহুর ঘুমিয়ে পড়েছে, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই হঠাৎ মনে হলো তার শরীরটা যেন পানিতে ভাসছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেলো কিন্তু মাথায় আঘাত লেগে তন্দ্রা ছুটে গেলো মুহূর্তে। স্মরণ হলো, সে সাগরতীরে মোটর-বোটের নীচে শুয়ে ছিলো।

জোয়ার আসায় তার বোটের তলায় পানি এসে গেছে।

বনহুর আর বিলম্ব না করে তার বোটের পাশের সুড়ঙ্গ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা বাহু তাকে জড়িয়ে ফেললো বলিষ্ঠভাবে। অন্ধকারে বনহুর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তবু অল্পক্ষণেই সে বুঝে নিলো শুধু

দুটি বাহু নয়; বেশ কয়েকটি শক্ত বলিষ্ঠ বাহু তাকে মজবুত করে বেঁধে ফেলেছে। নিঃশ্বাস ফেলতে তার কষ্ট হচ্ছে। এবার সে বুঝতে পারলো— এ বাহুগুলো কোনো মানুষ বা ঐ ধরনের জীবের নয়। অক্টোপাশের কবলে পড়েছে সে, এই তার জীবনের শেষ মুহূর্তে। একে অন্ধকার বনহুরের দেহটাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে অক্টোপাশটা, একটুও নড়তে পারছে না সে। সেকি ভীষণ প্রচণ্ড শক্তি অক্টোপাশের দেহে।

অক্টোপাশটা মানুষের রক্তের গন্ধ পেয়ে উঠে এসেছে এই স্থানে। তাছাড়া সাগরের জলরাশিও আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে বনহুর আর অক্টোপাশটার শরীরে।

বনহুর মরিয়া হয়ে উঠেছে। কোনো ক্রমে ছোরাখানা সে কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নিতে পারছেনা। একবার যদি কোনো ক্রমে ছোরাখানা বেল্ট থেকে খুলে নিতে পারতো তাহলে সে দেখে নিতো— কে জয়ী হয়। মৃত্যু হলেও সে সান্ত্বনা পেতো শেষ চেষ্টা সে করেছে।

বনহুর যখন নিজের কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা খুলে নেওয়ায় চেষ্টা করছিলো তখন তার গলায় অক্টোপাসের একটি বাহু এমনভাবে বেষ্টন করে ধরে ছিলো বনহুর কিছুতেই আর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হচ্ছিলো না। পড়ে গেলো সে ভূতলো অক্টোপাসের সঙ্গে বনহুরের যে অদ্ভুত লড়াই পৃথিবীর আলো দেখলোনা। রাতের অন্ধকারে দুর্ধর্ষ বনহুর আর ভয়ঙ্কর অক্টোপাশে চলেছে লড়াই।

হঠাৎ বনহুর তার দক্ষিণ হাতখানা কোমরের কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো। কৌশলে সে খুলে নিলো সুতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা। এবার সে হয়ে উঠলো দুর্দান্ত, জীবন-মরণ পণ করে সুতীক্ষ্ণ ছোরা দিয়ে অক্টোপাশের বাহুগুলো ঘচ্ ঘচ্ করে কেটে ফেলতে লাগলো। যদিও অক্টোপাশের বাহুগুলো ভয়ানক শক্ত ছিলো তবু বনহুরের ছোরার কাছে টিকতে পারলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অক্টোপাশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হলো দস্যু বনহুর।

বালির মধ্যে বসে পড়ে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগলো। সমস্ত দেহটা যেন থেতলে একাকার হয়ে গেছে। জীবনে বহু রকম বিপদের কবলে পড়েছে; কিন্তু আজকের মত বিপদ বুঝি তার জীবনে কোনোদিন আসেনি। কি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ঐ অক্টোপাশটা।

এক সময় রাত ভোর হয়ে গেলো, বনহুর বালির মধ্যে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের। জেগে উঠতেই প্রথম তার নজরে পড়লো তার অনতিদূরে বালির মধ্যে

ছিন্নভিন্ন একটি অক্টোপাশ পড়ে আছে। তার কতগুলো বাহু টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে এদিক সেদিকে। বনহুর জানে, তার ছোরার আঘাতেই অক্টোপাশটির মৃত্যু ঘটেছে। ছোরাখানা না থাকলে আজ তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো তাতে সন্দেহ নেই। বনহুর তার রক্তমাখা ছোরাখানা সাগরের পানিতে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলো। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে, তার সুন্দর শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে আছে। যেমন ভীষণ আঘাত পেলে মানুষের দেহে জখমের দাগ হয়, অক্টোপাশটির বাহুর বন্ধনে বনহুরের দেহেও তেমনি দাগ হয়ে গিয়েছিলো।

বনহুর জামাটা খুলে পরিষ্কার করে নিলো, মেলে দিলো তার মোটর-বোটটার গায়ে।

বেলা বাড়ছে— ক্ষুধা বাড়ছে বনহুরের, ওদিকের পাথর খণ্ডটার উপরে কালকের সেই পাকা বেলটা তখনও পড়ে রয়েছে। বনহুর পাথরখণ্ডটার উপর থেকে বেলটা তুলে নিয়ে ভেঙ্গে ফেললো, তারপর তৃপ্তি মিটিয়ে খেলো।

বেলগুলো যথেষ্ট বড় এবং সুমিষ্ট, তাই বনহুর প্রাণভরে ভক্ষণ করে নিলো।

অনেকটা সুস্থ বোধ করলো বনহুর।

এবার সে আবার প্রবেশ করলো বনের মধ্যে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলো, দিনের আলোয় বনের মধ্যে বেশ পরিস্কার সব নজরে পড়ছে। মানুষের সাড়া পেয়ে অনেক রকম ছোটোখাটো জীবজন্তু ছুটে পালাতে লাগলো। কোনো কোনো জায়গায় হরিণ হরিণী মনের আনন্দে ছোট ছোট গাছের পাতা ভক্ষণ করছিলো। কোথাও গাছের গর্তে শিয়ালী তার বাচ্চাদের নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। কোথাও বা জেব্রা তার লম্বা গলা বাড়িয়ে উঁচু কোনো ডাল থেকে কচি ডগাটা ভেংগে নেবার চেষ্টা করছিলো। বনহুরের পদশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখে নিলো, কিন্তু নড়লোনা— যেমন গাছের ডগা অন্বেষণ করছিলো তেমনি করতে লাগলো। বনহুর এদের নির্ভীক আচরণে মুগ্ধ হলো।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখলো— একটি বাঘিনী তার কতগুলো বাচ্চা নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে নাক ডাকাচ্ছে। হয়তো মানুষের আগমন সে বুঝতেই পারেনি।

বনহুর ব্যাঘ্র-গৃহিণীর নিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বিপরীত দিকে চলতে লাগলো। কিছুটা এগুতেই দক্ষিণ পাশের ঝোপের মধ্যে একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তার কানে প্রবেশ করলো। তৎক্ষণাৎ বনহুর ফিরে দাঁড়ালো, দক্ষিণ হস্তে তার রিভলভার ধরাই ছিলো। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো— একটি বন্যশুকর তীব্র বেগে ছুটে আসর্ছে, মাথাটা নীচু করে!

বন্যশূকরটি যে তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে তাকে কোনো ভুল নেই। বনহুর দ্রুত একটি গাছের গুড়ির আড়ালে আত্মগোপন করে রিভলভার উঁচু করে ধরলো। অব্যর্থ লক্ষ্য তার, বনহুরের গুলী সোজা গিয়ে বিদ্ধ হলো শূকরটির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে শূকরটি ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেলো ঝোপটার মধ্যে, বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ আর তার হলোনা।

বনহুর আবার অগ্রসর হলো, দক্ষিণ হস্তে সব সময় গুলী ভরা রিভলভার উদ্যত রয়েছে।

এটা আফ্রিকার জঙ্গল, প্রতিমুহূর্তে হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সমস্ত দিন ধরে বনহুর বনময় ঘুরে বেড়ালো, ইতিমধ্যে আরও দুটো গুলী তাকে ব্যয় করতে হয়েছে।

শেষ বেলা বনহুর চিন্তিত হয়ে পড়লো, দিনের আলোয় জঙ্গলটা তবু দেখতে পাচ্ছিলো, কিন্তু রাতের অন্ধকারে নিজেকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তার মোটর-বোটটা সেই সাগর-তীরে পড়ে আছে, সেখানে ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই।

বনহুর একটা বৃক্ষে আরোহণ করে রাত্রিযাপন করবে মনে স্থির করেছিলো, কিন্তু সবগুলো বৃক্ষই তার জন্য নিরাপদ বলে মনে হলোনা। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কোন্ বৃক্ষটায় আরোহণ করলে রাতের মত নিশ্চিন্ত হতে পারে।

কিন্তু আশেপাশে তেমন কোনো ছোটখাটো বৃক্ষ নজরে পড়লো না, সবগুলো প্রায় বিরাট বিরাট বৃক্ষ। বনহুর আরও কিছুটা এগিয়ে গেছে— হঠাৎ তার নজরে পড়লো, দূরে একটি আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। আলোটা কিসের বোঝা যাচ্ছে না, তবু বনহুরের মনে সন্দেহ জাগলো— নিশ্চয়ই কোনো মানুষ এ জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। নিকটবর্তী একটি বৃক্ষে আরোহণ করে চুপচাপ বসে রইলো।

বৃক্ষটির উপর হতে আলোটা আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবার বনহুর বুঝতে পারলো— আলোটা ছোট খাটো নয়, বেশ বড়; কোনো অগ্নিকুণ্ড হবে, বহুদূরে বনের মধ্যে জ্বলছে বলে অমন ছোট মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনো মানুষ এ জঙ্গলে এসেছে, কিন্তু সে মানুষ সভ্য জগতের না অসভ্য জংলী কিংবা কোনো ডাকাত বা দস্যু দল। যাই হোক রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাকে ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে, কাল সকালে সে ওদের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করবে।

বনহুর বৃক্ষশাখায় হেলান দিয়ে ঐ অগ্নিশিখাটাই লক্ষ্য করছিলো। প্রথমে মশালের আলো বলেই ভ্রম হয়েছিলো তার কিন্তু এবার তার সে ভুল ভেংগে

গেলো কারণ অন্ধকার যতই গাঢ় হচ্ছে ততই আলোক-রশ্মিটা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিলো। এখন আলোটা মস্ত বড় বলে মনে হলো।

রাত বাড়ছে।

বনহুরের সাহসী প্রাণেও একটা আতঙ্ক জেগে উঠছে। এমন গহন বনে, একা সত্যি ঘাবড়াবার কথা। কিন্তু বনহুর ভয়ে কুঁকড়ে যায়নি, একটু ভীতিভাব জাগলেও সেটাকে কিছুতেই সে প্রশ্রয় দিচ্ছিলোনা। বৃক্ষতলে গাঢ় জমাট অন্ধকার— বনের কোনদিকে এখন আর নজর চলছেনা, শুধু হিংস্র জীবজন্তুর ভয়ঙ্কর গর্জন আর মারামারি ধস্তাধস্তি চলেছে। সেকি উৎকট তীব্র হুঙ্কার। বনহুর আজ রাতের অন্ধকারে উপলব্ধি করছে আফ্রিকার জঙ্গলের আসল রূপ।

গোটা রাত হিংস্র জীবজন্তুর লড়াই-এর শব্দ শুনতে শুনতে রাত ভোর হয়ে গেলো। গাছে গাছে পাখির কলরব জেগে উঠলো, পূর্ব আকাশে দেখা দিলো সূর্য্যদেব।

বনহুর এবার বৃক্ষ থেকে নেমে দাঁড়ালো নীচে। রাত্রিতে এখানে কি ভয়ঙ্কর লড়াই না হয়ে গেছে, ওদিকে লক্ষ্য করতেই বনহুর চমকে উঠলো, বিরাট একটা লোমশ দেহ পড়ে আছে ঝোপঝার আর আগাছার মধ্যে। সেদিকে অগ্রসর হলো বনহুর, জীবটা মৃত না জীবিত। জীবিত হলে নিশ্চয়ই ওভাবে পড়ে থাকতোনা।

নিকটে পৌঁছে দেখলো বিরাট এক গরিলা চিৎ হয়ে পড়ে আছে, মরে শক্ত হয়ে গেছে ওর দেহটা। কিন্তু বনহুর আশ্চর্য হলো গরিলার দেহে কোথাও আঘাত বা ক্ষতচিহ্ন নেই। হঠাৎ গরিলাটা মারা পড়লো কেনো, রাতে মেঘ গর্জনের মত একটা হুঙ্কার তার কানে এসেছিলো, সেটা যে ঐ গরিলার কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো।

হঠাৎ বনহুরের নজর চলে গেলো গরিলার হাতের মুঠায়। বিস্মিত হলো সে, অবাক হয়ে দেখলো গরিলার দক্ষিণ হস্তের মুঠায় একটি সাপ জড়িয়ে আছে, সাপটার অর্দ্ধেকটা পড়ে আছে তার বাম হস্তের পাশে। বিরাট কালনাগ সাপ ওটা। বনহুর এবার বুঝতে পারলো সর্পদংশনে গরিলাটার মৃত্যু ঘটেছে। ক্রুদ্ধ গরিলা সর্পরাজকে দু'খণ্ড করে ফেলেছে বটে, কিন্তু তার পূর্বেই সর্পরাজ দংশন করেছিলো গরিলা মহারাজকে।

বনহুর এবার অগ্রসর হলো— গত রাতে যেদিকে সেই আলোক রশ্মিটা দেখা গিয়েছিলো সেদিকে। দিনের আলোয় বনটা হালকা আলোতে ভরে উঠেছে, কোথাও বা ঘন জমাট অন্ধকার। কারণ বনটা যেখান বেশি নিবিড় সেখানে অন্ধকার গাঢ়। বনহুর দক্ষিণ হস্তে রিভলভার ঠিক রেখে সতর্কভাবে চলতে লাগলো।

বনহুর কিছুটা এগুতেই হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটা সিগারেটের খালি বাক্স পড়ে আছে শুকনো পাতার মধ্যে। বনহুর সিগারেটের বাক্সটা হাতে তুলে নিলো। নিশ্চয়ই সভ্য সমাজের মানুষের পদার্পণ হয়েছে। একটা আশার আলো উঁকি দেয় বনহুরের মনে। যা হোক তবু এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে সঙ্গী পাওয়া যাবে। আরও কিছুটা অগ্রসর হতেই দৃষ্টি পড়লো গহন জঙ্গলের মধ্যে, একটি অগ্নিকুণ্ডের চিহ্ন দেখে বনহুর বুঝতে পারলো এ অগ্নিকুণ্ডের আলোকরশ্মি গত রাতে বৃক্ষশাখায় বসে সে দেখেছে। আশেপাশে লক্ষ্য করে আরও বুঝতে পারলো— সেখানে কোনো একটি তাবু গাড়া হয়েছিলো। কতগুলো বিস্কুটের এবং লজেন্সের খালি প্যাকেট বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে। সিগারেটের বাক্স, অর্ধদগ্ধ সিগারেটের অংশ, কমলালেবুর খোসা এমনি আরও কত রকম উচ্ছিষ্ট বস্তু পড়ে রয়েছে সে স্থানে। বনহুরের ধারণা সত্যি বলে মনে হলো। কিন্তু এরা কারা, এই আফ্রিকার জঙ্গলে কি উদ্দেশ্যেই বা আগমন হয়েছে তাদের?

এখন বনহুর তাদের সন্ধানে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো। শত্রু হোক আর মিত্র হোক, সেই সভ্য সমাজী মানুষদের সঙ্গে তাকে পরিচয় করে নিতে হবে---

বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, তার দৃষ্টি চলে গেলে ও- পাশে কয়েকটা কমলালেবুর খোসার পাশে ছোট্ট একটা রুমাল পড়ে আছে। বনহুর সরে এসে রুমালখানা তুলে নিলো হাতে। লেডিস রুমাল, রুমালের এক কোণে ইংলিসে লিখা আছে "শ্যালন", তাহলে কি দলটায় নারীও আছে? তাই হবে, নাহলে এ লেডিস রুমাল আসবে কি করে। পকেটে রাখলো রুমালখানা। বনহুর সমস্ত দিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালো। কতগুলো হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে হলো। প্রতি মুহূর্তে তাকে সজাগ হয়ে চলতে হচ্ছিলো। বেলা শেষ হয়ে আসছে, বনের মধ্যে ক্রমেই অন্ধকার নেমে আসছে বনহুর তবু অগ্রসর হচ্ছে।

হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠের আর্তচীৎকার তার কানে এসে পৌঁছতেই সজাগ হয়ে উঠলো। বনের মধ্য থেকেই আর্তনাদটা আসছে, বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটে চললো। খানিকটা অগ্রসর হতেই সে দেখতে পেলো একটি গরিলা জাতীয় জীব একটি যুবতীকে ধরে ফেলেছে। যুবতীর দেহে শিকারীর ড্রেস, মাথায় বফ্ করা ছোট চুল, পায়ে বুট, হাতের মুঠায় তখনও ধরা রয়েছে একটা বন্দুক।

বনহুর কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করে জীবটিকে লক্ষ্য করে তার রিভলভার উঁচু করে ধরলো, কিন্তু যুবতীটি এখন ঐ ভয়ঙ্কর গরিলা জাতীয় জীবটার বাহুর মধ্যে আবদ্ধা।

জীবটা বনহুরকে দেখতে পেয়ে বিরাট বিরাট তীক্ষ্ম দাঁতগুলো বের করে অদ্ভুত শব্দ করলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, এটা এক ধরনের ভয়ঙ্কর গরিলা জাতীয় জীব। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটিকে সে হত্যা করে ফেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সেকি ভয়ঙ্কর চেহারা জীবটির, মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ছে।

বনহুর আর বিলম্ব করতে পারে না, গরিলা জাতীয় জীবটার পা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেলো জীবটা। কিন্তু তার হাতের মুঠায় তখনও ধরা রয়েছে যুবতীটি।

বনহুর এবার তার ছোরাখানা মুক্ত করে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো জীবটার দেহের উপর।

জীবটা এবার যুবতীটিকে ছেড়ে দিয়ে বনহুরকে আক্রমণ করলো। বনহুরের হস্তে সুতীক্ষ্ম ধার ছোরা আর গরিলার দেহে অসীম শক্তি, নখগুলো ভীষণ ধারালো—দাঁতগুলোও তেমনি মারাত্মক তীক্ষ্ম।

কিছুক্ষণ চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি, কিন্তু বনহুরের ছোরার আঘাতে জীবটি বেশিক্ষণ যুদ্ধ করতে সক্ষম হলো না। বনহুরের ছোরা তার বক্ষে গেঁথে গেলো সমূলে।

জীবটা তীব্র চীৎকার করে বনহুরকে জাপটে ধরে ফেললো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বলিষ্ঠ লোমশ বাহু দুটো শিথিল হয়ে দুপাশে খসে পড়লো।

বনহুর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। ফিরে তাকাতেই দেখলো একদল লোক যুবতীটিকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি বনহুর ও জীবটার দিকে। সকলেরই মুখ ভয়ার্ত ফ্যাকাশে।

বনহুরকে উঠে দাঁড়াতে দেখে কয়েকজন ছুটে গিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো, দু'জন ধরে ফেললো তাকে। বনহুরের কপালের এক পাশে কেটে রক্ত ঝরছিলো।

শিকারীদল বনহুরকে তাড়াতাড়ি এক জায়গায় বসিয়ে তার সেবায় আত্মনিয়োগ করলো।

যুবতীর দেহে তেমন কোনো আঘাত বা ক্ষত হয় নি, তবে ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক যুবতীটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কাঁদছে, হয়তো লোকটির কন্যা হবে যুবতী। প্রৌঢ় বিলাপ করে বলছিলেন—কেনো তুই এলি মা? কেনো তোর এমন সখ চেপেছিলো? হায় হায়! ওনি যদি তোকে বাঁচিয়ে না নিতেন তাহলে এতোক্ষণ তোর অবস্থা কি হতো বল দেখি?

বৃদ্ধ যখন কন্যাকে ফিরে পেয়ে নানা রকম সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করছিলেন, তখন অন্যান্য লোকজন বনহুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

বনহুর একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে নিয়ে ওরা বনের মধ্যে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটা সমতল প্রশস্ত জলাভূমির পাশে গিয়ে হাজির হলো। বনহুর দেখলো একটি তাঁবু খাটানো রয়েছে। বনহুরকে সে তাবুর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো, এবং একটি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হলো। তাবুতে সব রকম জিনিসপত্র রয়েছে, এমন কি ঔষধপত্র সব রয়েছে তাদের সঙ্গে।

বনহুর অল্প সময়ে সুস্থ হয়ে উঠলো।

সুস্থ হয়ে সে জানতে পারলো, এরা একটি আবিষ্কারক দল। বয়স্ক ভদ্রলোক প্রফেসার ম্যাকমারা আর যুবতী তার কন্যা মিস শ্যালন—যার রুমাল সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো কমলালেবুর খোসার পাশে। অন্যান্য লোকজন প্রফেসার ম্যাকমারার ছাত্র ও কয়েকজন তাদের দেহরক্ষী। ছাত্র হলেও দলের অনেকেই বেশ বয়স্ক ছিলো, সবগুলো মিলে প্রায় পনেরো জনের মত লোক তাদের দলে। মেয়েদের মধ্যে শ্যালন একা, শ্যালনও যে তার পিতার ছাত্রী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর বুঝতে পারলো—এ দলের সন্ধানই সে পেয়েছিলো সেদিন। এদের আলোক-রশ্মিই তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো অগ্নি শিখারূপে। বনহুর আশ্বস্ত হলো এবার।

প্রফেসার ম্যাকমারা জীবনে বহু কিছু আবিষ্কার করেছেন— বিশেষ করে নতুন এবং অজানা জীবজন্তু আবিষ্কার করাই তার নেশা। আজ পর্যন্ত তিনি বহু রকম জীবের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদের ফটো সংগ্রহ করেছেন। এবার তিনি দলবল নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে আবির্ভাব হয়েছেন, নানা রকম বিপদের সম্মুখীন হয়েও তিনি অবিরত অদ্ভূত জীব-জন্তুর ফটো গ্রহণ করে চলেছেন।

আজও তিনি দূরে এক টিলার আড়ালে আত্মগোপন করে ঐ গরিলা জাতীয় জীবটার ছবি নিচ্ছিলেন ক্যামেরার সাহায্যে। হঠাৎ গরিলাটা তাদের তাবুর দিকে ছুটে আসে এবং দ্রুত হস্তে ধরে ফেলে মিস শ্যালনকে। শ্যালনকে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে গরিলা জাতীয় জীবটা গর্জন করতে করতে ছুটে পালায় গহন বনের দিকে। অতি দ্রুত গতিতে জীবটা তাদের চোখের আড়ালে চলে যায়, কাজেই দল-বল সহজে জীবটা ও শ্যালনকে খুঁজে পায় না। ওরা গুলী করার অনেক চেষ্টাও করেছে কিন্তু সফলকাম হয়নি। বন-বাদার ভেঙ্গে অগ্রসর হতে গিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলো প্রফেসার ম্যাকমারার দলবল।

বনহুর হঠাৎ শ্যালনের চীৎকার শুনতে পেয়ে ওকে উদ্ধারের জন্য ঝাপিয়ে পড়েছিলো তাই— রক্ষা। জীবটাকে হত্যা করার পর প্রফেসার ম্যাকমারা ও তাঁর দল-বল গিয়ে পৌঁছেছিলো সেখানে।

প্রফেসারের দল বনহুরকে দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শুরু করলো। সবাই মিলে বনহুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। প্রফেসার নিজে শ্যালনকে বনহুরের সেবায় নিয়োজিত করে দিলো।

বনহুর বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলো, সে কারো সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, হেসে ধন্যবাদ জানালো সবাইকে।

ম্যাকমারা বনহুরের পরিচয় জানতে চাইলেন— আপনার পরিচয় যদি জানান তবে আরও খুশি হবো।

বনহুর বললো— জাহাজডুবি হয়ে আমি এ জঙ্গলে এসে পড়েছি। প্রথমে তীরে এসে উঠি, তারপর এই গহন বনে। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হতে চললো আমাদের জাহাজডুবি হয়েছে। আমার নাম আলম। আমাদের নিজস্ব মালবাহী জাহাজে আমি জম্বুর বন্দরে যাচ্ছিলাম।

প্রফেসার ম্যাকমারা খুশি হলেন, আপনি আমার কন্যার জীবন রক্ষা করেছেন, আপনি এখন থেকে আমাদেরই একজন।

যাক্ বনহুর এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে তবু সঙ্গী-সাথী পেলো। প্রফেসার ম্যাকমারা বনহুরকে অত্যন্ত স্নেহ করতে লাগলেন। তিনি জাতীতে ক্রীশ্চান, তবু তার চালচলন ছিলো ঠিক বাঙালীদের মত। বনহুরের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হলেন।

বনহুরও প্রফেসার ম্যাকেমারার একজন অনুগত ছাত্রের মতই হয়ে পড়লো। প্রফেসার নিজে তাকে তার ব্যবহারী দ্রব্যাদি বের করে দিলেন। অনেক কয়টা দিন পর বনহুর পেট পুরে খেলো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি জন্মেছিলো, শেভ্ করে ফেললো। বনহুরের যে রূপ ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো আবার তা আত্মপ্রকাশ পেলো।

বনহুরের সুন্দর চেহারা দেখে সবাই মুগ্ধ বিস্মিত হলো। প্রফেসার দুহিতা শ্যালন আরও বেশি বিমুগ্ধ হলো, বনহুরকে ওর ভাল লেগেছে প্রথম থেকেই, সোজা সে বাবাকে বললো মিঃ আলমকে আমি বিয়ে করবো, বাবা।

কথাটা অতি স্বাভাবিক সচ্ছ ভাবেই বলেছিলো শ্যালন, কারণ তাদের মধ্যে বিয়েটা তেমন কোন লজ্জাকর ব্যাপার নয়। যাকে যার পছন্দ হবে তাকেই সে গ্রহণ করতে পারবে। কাজেই শ্যালনের কথায় যদিও বনহুর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো প্রথমে, পরক্ষণেই সামলে নিয়েছিলো নিজকে। ভয়ঙ্কর গহনে বনে, মৃত্যুর মুখোমুখি বসে এমন একটা উক্তি তার কঠিন মনকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলো, হেসেছিলো আপন মনে।

বনহুর আরও জানতে পারলো ম্যাকমারার একজন বিশিষ্ট ছাত্র ইতিমধ্যে বন্যশূকরের কবলে প্রাণ হারিয়েছে। একজন কোনো এক গণ্ডারের ছবি তোলাকালে ভীষণ আহত হয়েছিলো এখন সে সুস্থ হয়েছে।

জঙ্গলের এ জায়গাটা প্রফেসার ম্যাকমারার কাছে বেশ পছন্দনীয় মনে হওয়ায় এখানেই ক'দিন কাটিয়ে আরও কিছু ফটো সংগ্রহ করবেন বলে মনস্থির করে নিয়েছেন।

জায়গাটা জঙ্গলে পরিপূণ হলেও বেশ হাল্কা। মাঝখানে খানিকটা জলাভূমি, ঠিক একটা হ্রদের মত। আশেপাশে সমতলভূমি, ফাঁকা ফাঁকা গাছপালা। সূর্যের আলো প্রবেশে এখানে তেমন কোন অসুবিধা নেই। আফ্রিকার জঙ্গল হলেও জায়গাটা মনোরম। এক জায়গায় ক্যামেরা রেখে দূরদূরান্তের ফটো তুলে নেওয়া যায়।

বনহুর অবাক হয়ে এ সব ফটো তোলা লক্ষ্য করতে লাগলো। বহুদূরের বস্তুও এসব ক্যামেরার সাহায্যে একেবারে নিকটে এসে পড়ে হয়তো বা কোনো ব্যাঘ্র তার বাচ্চাদের নিয়ে অনেক দূরে বসে বসে খেলা করছে, প্রফেসার ম্যাকমারার ক্যামেরার দ্বারা তার বাচ্চাকাচ্চাসহ ফটো তুলে নিলো। হয়তো বা একদল হরিণ অনেক দূরে ছুটে পালাচ্ছে বা কোন ঝরণায় পানি পান করছে, ক্যামেরায় তার ছবি স্পষ্ট ধরে নেয়া হলো। ভয়ঙ্কর জীবজন্তু যেগুলোর নিকটে যাওয়া সম্ভব নয়, সে সব জীবের ফটোও অতিসহজে উঠিয়ে নিচ্ছিলেন ম্যাকমারা।

এসব ক্যামেরা চালাতে বেশ কিছু লোকের প্রয়োজন হচ্ছিলো। ম্যাকমারার ছাত্রগণ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলো তাঁকে সাহায্য করতে। কারণ কখনও ক্যামেরাটাকে উঁচুতে তুলে নিয়ে নীচের ছবি নেওয়া হচ্ছিলো, কখনও বা নীচ থেকে উপরের ছবি। হয়তো বা কোনো বৃক্ষের শাখায় বিরাট একটি অজগর সাপ ভীমরাজের মত বিশ্রাম করছে ম্যাকমারা তার ফটো নেবেন। কোনো গাছের ডগায় বসে আছে অজানা কোনো অদ্ভুত পাখি। ম্যাকমারা তার ফটোও উঠিয়ে নিতে ছাড়বেননা। এসব ছবি বা ফটো সংগ্রহ করতে তাঁকে ভীষণ পরিশ্রম করতে হচ্ছিলো, তবু বৃদ্ধের চোখেমুখে এতোটুকু ক্লান্তির ছাপ নেই। প্রফেসার ম্যাকমারা অবিরাম খেটে চলেছেন।

বনহুর নিশ্চুপ থাকতে পারেনা, সেও যোগ দেয় ম্যাকমারার ছাত্রদের সঙ্গে সাহায্য করতে।

খুশি হন ম্যাকমারা।

বিশেষ করে বনহুরের ব্যবহার এবং কার্যকলাপ তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। বনহুরকে তিনি সবার চেয়ে বেশি ভালবেসে ফেললেন, এতে ম্যাকমারার কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে ঈর্ষা দেখা দিলো।

ম্যাকমারা যখন ক্যামেরা চালান তখন নানা রকম হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ হবার সম্ভাবনা থাকে, কোনো কোনোদিন ব্যাঘ্র হামলা করে বসে, কোনোদিন বা দাঁতওয়ালা বন্য শূকর। কোনোদিন তার চেয়েও কোনো ভয়ঙ্কর জীব হানা দেয়। পাহারাদারগণ সামলে উঠতে পারেনা, বনহুর এ ক'দিনে অনেকগুলো হিংস্র জীব হত্যা করেছে। বনহুরের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। শুধু ম্যাকমারাই নয় সবাই স্তম্ভিত হতবাক হয়ে যেতো, মিস শ্যালন তো এক মুহূর্তে বনহুরকে ছেড়ে থাকতে পারতোনা।

বনহুর নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও শ্যালন সব সময় তার পাশে ছায়ার মত লেগে থাকতো। ওকে ছেড়ে থাকতে নাকি ওর মোটেই ভাল লাগেনা।

আফ্রিকার জঙ্গলে, মৃত্যু ভয়ঙ্কর মুহূর্তে শ্যালনের মত একটি শ্বেতাঙ্গিনী যুবতীকে পাশে পেয়ে বনহুর বিব্রত হয়নি বরং সে খুশিই হয়েছে। শ্যালনের সরল-সহজভাব বনহুরকে মুগ্ধও করেছে।

শ্যালনের মধ্যে ছিলোনা কোনো সঙ্কোচ বা দ্বিধা। সে এমন ভাবে বনহুরের সঙ্গে মিশতো, যা সভ্যসমাজের যে কোনো লোকের চোখে অশোভনীয়।

বনহুর এখন সম্পূর্ণ প্রফেসার ম্যাকমারার লোক বনে গেছে। ম্যাকমারা যখন তখন বনহুরকে নিয়েই তার কঠিন আলাপ-আলোচনা করতে শুরু করলেন অবশ্য তার অন্যান্য ছাত্রগণও তখন সঙ্গে থাকতো।

বনহুর সেদিন তাবুর বাইরে বসে রাইফেলটা পরিষ্কার করছিলো, এমন সময় মিস শ্যালন এসে বসলো তার পাশে। বনহুরের কাঁধে মাথা রেখে বললো— মোটেই ভাল লাগছে না আলম।

বনহুর যেমন রাইফেলটা পরিষ্কার করছিলো তেমনি করতে করতে বলে—হঠাৎ ভাল না লাগার কারণ?

তুমি চলে এলে আমাকে তাবুতে একা ফেলে, তাই।

এই সামান্য কারণে তুমি------

আলম, তোমাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত বাঁচবোনা। শ্যালন বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

বনহুর তাকালো এদিক-সেদিকে; কেউ দেখে ফেললো নাকি!

শ্যালন তখন বনহুরের গণ্ডে চুম্বন দিতে শুরু করেছে। অদ্ভুত এ মেয়েটির কবল থেকে বনহুর নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেনা। ওর কোঁকড়ানো রাশিকৃত চুলে বনহুরের মুখমণ্ডল ঢাকা পড়ে যায়।

বনহুর বলে—ছিঃ, শ্যালন, একি হচ্ছে?

কেন তোমার ভাল লাগছেনা?

বনহুর কোনো জবাব দিতে পারেনা।

শ্যালন পুনরায় বলে— আলম, তুমি বড্ড সেকেলে। তোমার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। বেরসিক তুমি। খিলখিল করে হেসে উঠে মিস শ্যালন।

বনহুর শ্যালনকে তুমি বলে ডাকতো, শ্যালনও ওকে তুমি বলে সম্বোধন করতো। শ্যালনের যেমন প্রথম থেকেই বনহুরকে ভাল লেগেছিলো, তেমনি বনহুরেরও ভাল লেগেছিলো ওকে— তাই বলে বনহুর ওকে তো গ্রহণ করতে পারেনা। শ্যালনের সান্নিধ্য ভাল লাগতো এই যা।

গহন জঙ্গলে শ্যালন এক নতুন উন্মাদনা জোগালো বনহুরের হৃদয়ে। চঞ্চল হরিণীর মতই ছিলো শ্যালন। সব সময় বন্দুক নিয়ে ছুটতো এদিক-সেদিকে। আবার ভয়ও পেতো, সেদিনের ঘটনার পর; একা যাওয়া তার হোতনা। যখনই সে বন্দুক হাতে শিকার করতে বের হতো তখন বনহুরকে সে কিছুতেই ছাড়তোনা। ওকে টেনে-হিচড়ে তবুও সঙ্গে নিতো।

বনহুরের নিঃসঙ্গ জীবন উচ্ছ্বল হয়ে উঠতো, শ্যালনের সঙ্গ তাকে মোহগ্রস্ত করে ফেলতো। বনহুরের জীবনে বহু নারী এসেছে, কিন্তু বনহুর কাউকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি একমাত্র মনিরা আর নূরীকে ছাড়া। এ দুটি নারীকেই বনহুর গ্রহণ করেছে অন্তর দিয়ে, উজার করে দিয়েছে সে সমস্ত সত্ত্বা। শ্যালনকে বনহুরের ভাল লাগে, কিন্তু ভালবাসতে পারে না সে।

শ্যালন যখন তার সুকোমল শুভ্র বাহু দুটি দিয়ে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে তখন সে হারিয়ে ফেলে নিজেকে, তার মধ্যে জেগে উঠে পৌরুষত্ব মনোভাব, কিন্তু সাবধানে সে নিজেকে সংযত রাখে। সে পুরুষ কিন্তু ব্যাভিচারী নয়।

শ্যালন বলে— আলম, আমি তোমাকে কত ভালবাসি আর তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না।

কে বলে আমি তোমাকে ভালবাসি না?

সত্যি তুমি আমাকে ভালবাসো?

হাঁ শ্যালন।

তবে তুমি আমাদে ধরা দাও না কেনো?

সব সময় তো তোমার কাছে রয়েছি। তুমি আমাকে এক রকমই ধরেই রেখেছ সর্বক্ষণ।

আলম!

বলো?

দেশে ফিরেই আমাদের বিয়ে হবে।

আনমনা হয়ে যায় বনহুর।

শ্যালন ওকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে বলে— আলম, তুমি কথা বলছো না কেনো?

উঁ।

আলম, বলো রাজি আছো আমাকে বিয়ে করতে?

বনহুর কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

শ্যালন করুণ কণ্ঠে বলে— তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না আলম, আমি মরে যাবো-----

বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে একটি মুখ, সেও বলেছিলো---হুর, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না হুর----- একটা দীর্ঘশ্বাস বনহুরের বুক চিরে বেরিয়ে আসে।

শ্যালন ব্যথিত নয়নে তাকিয়ে থাকে, অসহায় করুণ সে আঁখি দুটি। এক রাশ ঝাঁকড়া সোনালী চুলের ফাঁকে তীব্র ঘোলাটে দুটি চোখ।

বড় মায়া হয় বনহুরের, মিথ্যা বলতে দোষ কি। জীবনে সে লোকের মঙ্গলের জন্য বহু মিথ্যা বলেছে, আজও না হয় শ্যালনকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিলো— ক্ষতি কি তাতে। কিন্তু একটা অবলা নির্বোধ মেয়েকে এতোবড় মিথ্যা আশ্বাস সে চট করে দিতে পারলো না। বনহুর ওকে টেনে নিলো নিবিড় করে।

শ্যালন ভুলে গেলো বিয়ের কথাটা।

বনহুরের বাহু-বন্ধন থেকে শ্যালন যখন মুক্তি পেলো তখন তার শ্বেত গণ্ডদ্বয় রাঙা হয়ে উঠেছে।

শ্যালনের চোখে-মুখে খুশির উৎস।

❑

তাবুর বাইরে অগ্নিকুণ্ড দপ দপ করে জ্বলছে। কয়েকজন পাহারাদার রাইফেল কাঁধে সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে তাবুর বাইরে নয় ভিতরে। এ জঙ্গলে রাতে বাইরে থাকা কিছুতেই নিরাপদ নয়। একজন পাহারাদার বাঘের কবলে প্রাণ হারিয়েছে ক'দিন আগে রাতে বাইরে বেরিয়েছিলো পায়খানা করতে।

এরপর তাবুর বাইরে বের হওয়া কারো সম্ভব নয়।

রাতে জেগে জেগেই প্রায় সময় কাটিয়ে দেয় সবাই। ঘুম কম, জেগে থাকাই বেশি। তবু একদল ঘুমায় আর একদল জেগে থাকে।

শেষ রাতের দিকে বনহুর ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেলো। তাবুর বাইরে মেঘ গর্জনের মত হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। সে হুঙ্কারের শব্দে মাটি যেন থর থর করে কেঁপে উঠছে।

বনহুর উঠে বসলো তার বিছানায়, দক্ষিণ হস্তে চেপে ধরলো তার রিভলভারখানা। সে বুঝতে পারলো কোন ভয়ঙ্কর জীবের গর্জন এটা। ব্যাঘ্র বা সিংহের হুঙ্কার নয়। এ শব্দটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। তাবুর সকলেই জেগে উঠেছে। এমনকি শ্যালন পর্যন্ত জেগে তার পিতার পাশে বসে থর থর করে কাঁপছে।

প্রফেসার ম্যাকমারা চাপা কণ্ঠে বনহুরকে তাঁর পাশে ডেকে নিলেন, তারপর বললেন— এটা কিসের আওয়াজ বলে তোমার মনে হয়?

বনহুর একটু ভালভাবে শুনে নিয়ে বললো— স্যার, এটা বাঘ-ভল্লুক বা সিংহের কণ্ঠের আওয়াজ নয়, নতুন কোন জীব। জীবটা যে অতি ভয়ঙ্কর তাকে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুরও প্রফেসার ম্যাকমারার অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁকে স্যার বলেই সম্বোধন করতো।

বনহুরের কথায় বললো মিস শ্যালন—আমার বড্ড ভয় করছে আলম, তুমি আমার পাশে এসো।

ম্যাকমারা বলে উঠলেন— কোনো ভয় নেই মা, আমাদের তাবু অত্যন্ত মজবুত ভাবে তৈরি। কোনো রকম জীব-জন্তু এ তাবুর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু জীবটার ফটো নেবো আমি------

ম্যাকমারার কথা শেষ হয় না, তাবুর এক ধারের পর্দা নড়ে উঠে ভীষণ ভাবে, সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে যায় তাবুক খানিকটা অংশ। একখানা লোমশবাহু প্রবেশ করে তাবুর ছেঁড়া অংশ দিয়ে।

মিস শ্যালন বাহুটার দিকে তাকিয়ে তীব্র চীৎকার করে ঢলে পড়ে শয্যায় উপরে।

প্রফেসার ম্যাকমারা ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হতে যাচ্ছিলেন, কন্যাকে ঢলে পড়তে দেখে তিনি ক্যামেরা রেখে ছুটে এলেন—মা শ্যালন! মা শ্যালন---

লোমশ বাহুটা তখন তাবুর মধ্যে চক্রাকারে ঘুরে ফিরছে।

স্যার ম্যাকমারা আর বনহুর ছাড়া সবাই ভীত ভাবে আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। তাবুর মধ্যে সবাই ছুটোছুটি করে এ ওর গায়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ছে। লোমশ বাহুটা লক্ষ্য করে বনহুর গুলী ছুড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা অদৃশ্য হলো তাবুর বাইরে।

বনহুর ব্যস্তকণ্ঠে সবাইকে বললো—আপনারা তাবুর দক্ষিণ দিকে চলে আসুন, চলে আসুন শীগ্গীর---

উঠি-পড়ি করে সবাই তাবুর ভাল অংশে চলে এলো, কিন্তু সকলেরই চোখে মুখে ভীত-কম্পিত-ভাব। প্রায় অনেকেই আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। বনহুরের পিছনে সবাই এসে জড়ো হলো, কেউ কেউ সাহস করে রাইফেল

বাগিয়ে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। প্রফেসার ম্যাকমারা ক্যামেরা ও কন্যাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

বাইরে গর্জনটা এবার আরও ভয়ংঙ্কর মনে হলো। জীবটা তার আহত হাতখানা নিয়ে বুঝি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সম্পূর্ণ তাবুটা দুলে উঠলো। বাইরে যেন ভীষণ ঝড় শুরু হয়েছে।

বনহুর রিভলভার উদ্যত করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য সবাইকে বললো তাদের নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকতে।

আশ্চর্য! আবার একখানা হাত বেরিয়ে এলো পূর্বের সেই ছেড়া অংশ দিয়ে। বনহুর অবাক হয়ে দেখলো এটা সেই হাত, যে হাতে বনহুর একটু পূর্বে গুলী বিদ্ধ করেছিলো। লোমশ বাহু দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। হাতখানা এবার দ্রুত কিছু অন্বেষণ করে ফিরছে বলে মনে হলো।

❑

তাবুর মধ্যে আবার একটা আর্ত চীৎকার জেগে উঠলো, গুলী ছোড়া তো দূরের কথা, সবাই নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য এ-ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো।

বনহুর পর পর গুলী ছুড়তে লাগলো।

দক্ষিণ হাতখানা বুঝি এবার অকেজো হলে গেলো জীবটার, তাই সে গর্জন করে বাম হস্ত প্রবেশ করিয়ে দিলো তাবুর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলো মিস শ্যালনের সংজ্ঞাহীন দেহটা। পরক্ষণেই তাবুর ফাঁকে ভেসে উঠলো একখানা বিশাল মুখ।

বনহুর এবং অন্যান্য সবাই দেখলো একটা বিরাট আকার রাক্ষসের মুখ। বুঝতে বাকী রাইলো না, জীবটা অন্য কিছু নয় গরিলা।

বনহুর এবার গুলী ছুড়তে পারলো না চট করে, কারণ গরিলা মহারাজের হাতের মধ্যে মিস শ্যালনের সংজ্ঞাহীন দেহটা রয়েছে। অন্য কাউকে না নিয়ে মিস শ্যালনকে নেবার মতলব দেখে বনহুরের চক্ষুস্থির হলো। ততক্ষণে গরিলা মহারাজ বিরাট পা ফেলে হুম্ হুম্ আওয়াজ তুলে গহন বনে অদৃশ্য হয়েছে।

প্রফেসার ম্যাকমারার আর্তনাদে তাবুর অভ্যন্তর ভরে উঠলো, বাঁচাও! বাঁচাও! আমার কন্যাকে তোমরা বাঁচাও---

শুচিভেদ্য অন্ধকারে কিছু আর দৃষ্টিগোচর হলোনা। শুধু শোনা গেলো পাশের জঙ্গলের মধ্যে মড়মড় শব্দে ডালপালা ভেংগে পড়ার শব্দ।

বনহুর কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলোনা, একটা অব্যক্ত বেদনা তার অন্তরটাকে চুর্ণবিচুর্ণ করে ফেললো। শ্যালনের সরল সহজ মুখখানা তার মানস পটে ভেসে উঠতে লাগলো স্পষ্ট হয়ে। গরিলা মহারাজ তখন চলে গেছে অনেক দূর। বনহুর পাথরের মূর্তির মত থ'হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রফেসার ম্যাকমারা বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে বলে উঠলেন—আলম, তুমি একবার আমার শ্যালন মাকে রক্ষা করেছিলে, এবার কেনো তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো? যাও, যাও আলম আমার মাকে রক্ষা করে নিয়ে এসো।

বৃদ্ধের আর্তকণ্ঠে বনহুরের মন ভেংগে পড়ছিলো, রাতের অন্ধকার না হলে বনহুর এতোক্ষণ ছুটে যেতো ঐ গরিলা রাজের পিছু পিছু, কিন্তু এখন সে উপায়হীন, এতোটুকু আলো নেই কোথাও, তাছাড়া এটা যা-তা বন নয় আফ্রিকার জঙ্গল। বনহুর জীবনের মায়া করেনা, কিন্তু গরিলার কবল থেকে শ্যালনকে রাতের অন্ধকারে গহন বনে উর্দ্ধার করে নিয়ে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ম্যাকমারার ব্যাকুলতা বনহুরকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললো।

আলম, আমার মাকে রক্ষা করো। রক্ষা করো আলম। আমি শ্যালনকে হারিয়ে বাঁচতে পারবোনা। আমার শ্যালন মা শ্যালন---

বনহুর আর স্থির থাকতে সক্ষম হলোনা, একটা ফুল পাওয়ার টর্চ ও গুলী ভরা রিভলভার নিয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে পড়লো।

অন্যান্য সবাই হায় হায় করে উঠলো।

প্রফেসার ম্যাকমারা নিজেও ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বনহুর অন্যান্যদের লক্ষ্য করে বললো—স্যারকে ধরে রাখুন, আমি চেষ্টা করে দেখি কিছু করতে সক্ষম হই কিনা। বনহুর বেরিয়ে গেলো। ম্যাকমারাকে ধরে ফেললো অন্যান্য ছাত্রগণ।

বনহুর টর্চের আলো ফেলে ছুটতে শুরু করলো। গরিলাটি শ্যালনকে নিয়ে এত দ্রুত সরে পড়েছে যে বনহুর ছুটেও তার সন্ধান করতে পারলো না। টর্চের আলোতে সে দেখতে পেলো এক পাশের ঝোপ ঝাড় আর জঙ্গল থেতলে গুড়িয়ে কোনো বন্য হস্তী যেন চলে গেছে।

বনহুর সেই পথে অগ্রসর হলো।

একটু পূর্বে গরিলা-রাজ ঐ পথে গেছে বলে অন্যান্য হিংস্র জীব-জন্তু সব সরে পড়েছিলো এবং সে কারণে এখন পর্যন্ত বনহুর সম্মুখে তেমন কোনো জন্তু দেখতে পেলো না।

গাঢ় অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে চারদিকে ভালভাবে লক্ষ্য করে বনহুর এগুতে লাগলো। দুঃসাহসী প্রাণ দস্যু বনহুর এতোটুকু ভরকে গেলো

না বা তার হৃদয় কম্পিত হলো না। যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে শ্যালনকে। এতো বিপদেও শ্যালনের একটি কথা বার বার মনে পড়ছে---আলম, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না--- শ্যালন ভালবেসেছিলো বনহুরকে, মাত্র ক'দিনের পরিচয়েই সে এতো আপন করে নিয়েছিলো, যা বনহুরের প্রাণেও রেখাপাত করেছিলো।

সবচেয়ে বনহুরের বেশি ভাল লেগেছিলো শ্যালনের সরলতা, সহজ মনোভাব। বনহুরের সঙ্গে মিশতে সে এতোটুকু দ্বিধা বোধ করতো না বা সঙ্কোচিত হতো না। উচ্ছল মনোভাব নিয়ে সে নিজেকে বিলিয়ে দিতো বনহুরের মধ্যে।

আজ এই ভয়ঙ্কর বিপদসংকুল মুহূর্তে শ্যালনের মায়াময় মুখখানা গভীরভাবে আকর্ষণ করছে বনহুরকে। বনহুর ভুলে গেছে তার চারদিকে হিংস্র জীব-জন্তুর অস্তিত্ব, ভুলে গেছে নিজের জীবনের মায়া। শ্যালনকে তার রক্ষা করতেই হবে। মৃত্যুভয়ে ভীত নয় সে, নির্ভীক সাহসী মন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে প্রফেসার ম্যাকমারার কন্যা উদ্ধারে।

বনহুরের ভয় হচ্ছে, গরিলা মহারাজ শ্যালনকে তো হত্যা করে ফেলেনি! শ্যালনকে যদি নিহত করে থাকে, একটি সুন্দর ফুলের মত জীবন অকালে ঝরে পড়বে এই গহন জঙ্গলে, ইস্ কি ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক সে পরিণতি---

হঠাৎ বনহুর চমকে উঠে, তার সম্মুখে কিছুটা দূরে সাদা কিছু দেখা যায়। দ্রুত চর্চের আলো ফেলে সেদিকে এগিয়ে যায় বনহুর। সাদা জিনিসটার নিকটে পৌঁছে দেখতে পায় সেটা শ্যালনের ওড়না।

বনহুর ওড়নাখানা হাতে নিয়ে দেখে, বুঝতে পারে এ দিকেই চলে গেছে গরিলাটা শ্যালনকে নিয়ে। বনহুর বন-জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হলো সম্মুখের দিকে।

কিছুটা এগুতেই ঝোপের মধ্যে প্রায় মাটির সঙ্গে লাগানো দুটো বাল্বের মত জ্বলন্ত গোলক তার চোখে পড়লো। বনহুর টর্চের আলো ফেলতেই শিউরে উঠলো, ভয়ঙ্কর একটি অজগর সাপ পথ রোধ করে মাটিতে পড়ে আছে। বাল্বের মত অগ্নি গোলক দুটি অজগরের চোখ। সাপের চোখ যে অন্ধকারে এতো তীব্র আলোর মত মনে হয় বনহুর এর আগে এমন করে দেখেনি।

সর্পরাজ বনহুরকে দেখে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো, মাঝে মাঝে তার মুখের মধ্যে থেকে জিভ্‌টা লিক্ লিক্ করে বেরিয়ে আসছে, সে কি তীক্ষ্ণ ছোরার মত লম্বা জিভ্!

বনহুর বিলম্ব করতে পারে না।

সর্প রাজের দেহটা বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে বিস্তার করছিলো। শীঘ্র সরে যাবার কোনো লক্ষণ নেই, বনহুর সর্পরাজের দেহের উপর দিয়ে লাফিয়ে পাড় হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিপদ ওৎপেতে ছিলো তার জন্য। একটি সিংহী তার শাবক নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো, কোনো শিকারের সন্ধানেই বুঝি বেরিয়েছে সিংহীরাণী। বনহুরের উপর নজর পড়তেই গর্জন করে উঠলো। সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ! গোটা বনভূমি যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

থমকে দাঁড়ালো বনহুর। দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার।

সিংহীরাণী সম্মুখে লোভাতুর শিকার দেখে খুশি হয়েছে বলে মনে হলো। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আবার গর্জন করে উঠলো। এবার সে আক্রমণ করে বসবে বনহুরকে। বনহুর বিলম্ব না করে সিংহীকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। মাত্র একটি গুলী—সিংহীর মাথাটা ফুটো করে গুলীটা বেরিয়ে গেলো ঘাড়ের পাশ দিয়ে। একটু নড়তে পারলো না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো তার বাচ্চাগুলোর পাশে।

বনহুরের মায়া হলো, এতোগুলো বাচ্চাকে সে মা-হারা করলো। কিন্তু উপায় ছিলো না। আবার চললো সম্মুখপানে।

তাদের তাবু ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছে বনহুর। এতোক্ষণ তাবুর সম্মুখের অগ্নিকুণ্ডটা তবু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। এখন তাও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে।

গভীর রাতে আফ্রিকার জঙ্গলে দস্যু বনহুর নির্ভীকচিত্তে অগ্রসর হচ্ছে। সুন্দর মুখমণ্ডলে কঠিন সংকল্পের ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বলিষ্ঠ হস্তদ্বয়ের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে—যে কোন হিংস্র জন্তুকে সে এই মুহূর্তে কাবু করবে তাতে কোনো ভুল নেই।

কিন্তু এতো করে সন্ধান চালিয়েও বনহুর গরিলা এবং শ্যালনের সন্ধান পেলো না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো সে তাবুতে ফিরে আসতে।

সমস্ত রাত্রিটা নানা রকম আলোচনায় কেটে গেলো। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর দলবল নিয়ে বের হলো। শ্যালনের সন্ধান তাকে করতেই হবে। বনহুর জানে সত্যিকারের গরিলা মানুষ ভক্ষণ করে না, তারা মানুষকে হত্যা করে পিষে থেতলে মেরে ফেলে। আবার কতগুলো গরিলা আছে যারা মেয়েছেলে দেখলে পুতুল মনে করে খেলার জন্য হরণ করে নিয়ে যায়, হত্যা করে না। শ্যালনকেও গরিলা পুতুল মনে করে নিয়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই তাহলে তাকে হত্যা করবে না সে কিছুতেই।

প্রত্যেকের হস্তেই গুলী ভরা রাইফেল। কারো কারো হস্তে রিভলভার বা পিস্তল। বনহুর রিভলভার এবং ছোরা সঙ্গে নিয়েছে।

গত রাতে যে পথে বনহুর গরিলার সন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলো আজও তারা সে পথ ধরে অগ্রসর হলো। বেশ কিছুদূর এগুনোর পর সবাই অবাক হয়ে দেখলো—একটি মৃত সিংহীর পাশে কতগুলো সিংহ শাবক ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বা মায়ের বুকের দুগ্ধের সন্ধান করছে, কেউ বা দেহের উপর চড়ে মায়ের নিদ্রা ভঙ্গের চেষ্টা করছে।

বনহুর বললো—স্যার, কাল রাতে বাধ্য হয়ে আমি ঐ বাচ্চাগুলোকে মা-হারা করেছি। চলুন, এখানে বিলম্ব করা উচিৎ হবেনা।

সবাই আবার চলতে শুরু করলো।

সে কি গহন বন!

প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে নিলো। কারণ চারদিকে ক্রুদ্ধ হিংস্র জন্তু যে কোনো সময়ে লাফিয়ে পড়তে পারে তাদের ঘাড়ে।

প্রফেসার ম্যাকমারার মুখে এতোদিন যে জানার উন্মাদনা পরিলক্ষিত হতো, আজ তা সমূলে অন্তর্ধান হয়েছে। কন্যার এই বিপদে ভদ্রলোক একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। মুখখানা তার কালো হয়ে গেছে অমাবস্যার অন্ধকারের মত। একটি কথাও তার কণ্ঠ দিয়ে বের হচ্ছেনা। তিনি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দলবলকে অনুসরণ করছেন মাত্র।

বহুদূর অগ্রসর হয়েও গরিলা বা শ্যালনের সন্ধান পাওয়া গেলোনা। বেলা গড়িয়ে আসছে, ক্ষুধায় সকলের পেটে আগুন ধরে গেছে। তাবু থেকে কিছু পাউরুটী আর মাখন ওরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো, চলতে চলতে কেউ খেয়ে নিচ্ছিলো তারই দু'একটা

বনহুরের ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন উবে গিয়েছিলো, তার মনে সদা উদয় হচ্ছে গরিলা আর শ্যালন।

বড় পিপাসা বোধ করায় বনহুর ফ্লাক্স থেকে পানি ঢেলে পান করে নিলো, এবার অনেকটা শান্তি পেলো সে। ক্ষুধা সহ্য করা বনহুরের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো, কারণ সে দস্যু—তাকে সব সময় নানা ভাবে কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, খাবার সময় তার কোথায়।

সিদ্ধ জিনিসের চেয়ে ফলমূল ছিলো বনহুরের প্রিয় খাদ্য। তার আস্তানায় বনহুরের জন্য সব রকম ফল সংগ্রহ করে রাখা হতো। দেশ-বিদেশ থেকে ফল আসতো। সর্দারের খাদ্যের ফল সংগ্রহের জন্যই দূর দূর দেশে তার অনুচর ছিলো, এরা সব সময় বিদেশ থেকে ফল আমদানি করতো।

বনহুর আফ্রিকার জঙ্গলে ফল খেয়ে তৃপ্তি লাভ করতো। ক্ষুধা পেলেই নানা রকম ফল পেড়ে খেতো সে। ছোট বেলা হতে এটা ছিলো বনহুরের অভ্যাস।

আজ বনহুর ফল ভক্ষণের নেশাও ত্যাগ করেছে।

ফ্লাক্স থেকে পানি পান করে ফিরে দাঁড়াতেই বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো একটা গাছের পাশে, একখানা লেডিস্ সু'পড়ে আছে। বনহুর দ্রুত গিয়ে লেডিস্ সু'খানা হাতে তুলে নিলো।

ততক্ষণে দলবল সবাই এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে।

ম্যাকমারা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো—এ যেন আমার শ্যালনের জুতা। হায়! হায়! মাকে আমার হত্যা করে ফেলেছে গরিলাটা---

বনহুর সান্ত্বনা বাক্যে বললো—স্যার, আপনি বিচলিত হবেননা। শ্যালন নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। আপনি বরং কয়েকজনকে নিয়ে তাবুতে ফিরে যান। আমি এদের নিয়ে আপনার শ্যালনের সন্ধান করে দেখছি।

অন্যান্য সবাই বনহুরের কথায় সায় দিলো, কয়েকজন রাজী হলো বনহুরের সঙ্গে শ্যালনের সন্ধানে যেতে।

অগত্যা প্রফেসার ম্যাকমারা কয়েকজনকে নিয়ে ফিরে চললেন তাবুতে।

বনহুর অগ্রসর হলো সামনের দিকে।

বনহুর মাত্র পাঁচজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছিলো তাকে সাহায্যের জন্য।

বেলা যখন শেষ প্রহর তখন বনহুর সঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত হলো এক পাহাড়ের মত উঁচু টিবির পাশে। সেই স্থানটা আরও ঘন বনে আচ্ছাদিত। বিরাট বিরাট শাল আর সেগুন গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত রকম অজানা গাছের সমারোহ।

উঁচু পাহাড়ের মত টিবিটার আশে পাশে বহু জলাভূমি নজরে পড়লো। হঠাৎ বনহুর চমকে উঠলো—জলাভূমির নিকটে ভিজে মাটিতে কয়েকটি পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে, সেই ভয়ঙ্কর গরিলা মহারাজের পদচিহ্ন বলেই মনে হলো—তবে অন্য কোনো গরিলাও হতে পারে। তবু বনহুরের হৃদয়ে একটা আশার আলো উঁকি দিয়ে গেলো।

বনহুর তার পঞ্চসাথীকে লক্ষ্য করে বললো—এ পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমরা অগ্রসর হবো।

বিলম্ব না করে ওরা উঁচু টিবি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। বিরাট পদচিহ্ন ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। বনহুরের সঙ্গীগণ কিছুটা ভীত আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে বলে মনে হলো।

বনহুর তাদের পিঠ চাপড়ে সাহস দিলে বললো—ভয় কি মৃত্যু যখন একদিন হবেই, তখন না হয় দু'দিন আগেই মরলেন। ঘরে রোগে ধুকে মরার চেয়ে বীরের মত মরবেন।

বনহুরের কথা শুনে আবার তাদের সাহস হলো, নব উদ্যমে পাহাড়টার গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। প্রত্যেকের হস্তেই গুলী ভরা রাইফেল।

বনহুরের হস্তে রিভলভার পিঠে বাঁধা আছে রাইফেল। কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরা। সম্পূর্ণ কালো ড্রেস তার শরীরে।

বেশ কিছুটা উপরে উঠার পর তারা লক্ষ্য করলো—পদচিহ্ন বামদিকে বাঁকা হয়ে চলে গেছে। ওদিকে জঙ্গলটা বেশ ফাঁকা বলে মনে হলো। কিন্তু অল্প কিছুটা এগুনোর পর সম্মুখে দেখা গেলো প্রকাণ্ড একটা সুড়ঙ্গ মুখ। সুড়ঙ্গ মুখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কারণ সুড়ঙ্গ মুখে অনেকগুলো ডালপালা স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। কিন্তু বনহুর পদচিহ্ন লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো, তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা আনন্দদ্যুতি। নিশ্চয়ই এ গুহাটা সেই গরিলা মহারাজের। এখানেই হয়তো পাওয়া যাবে শ্যালনকে।

বনহুর ও তার দল বল গুহাটার নিকটে এসে উপস্থিত হলো। গুহার মুখে এমন ভাবে আগাছা আর ডালপালা রাখা হয়েছে, গুহার মধ্যে প্রবেশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বনহুরের সঙ্গীগণ ভয় পেয়ে গেছে বলে মনে হলো, ওরা আর এগুতে রাজি নয়। বনহুর অগত্যা নিজেই ডালপালা সরাতে শুরু করলো।

অন্যান্য সকলে তাকে সাহায্য করলো বটে, কিন্তু কেউ সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করতে সাহসী হলোনা। অনেক চেষ্টায় খানিকটা ফাঁকা করে নিয়ে সেই পথে বনহুর সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করলো।

বনহুরের সঙ্গীগণ এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো, সকলেরই মুখ ভয়ে বিবর্ণ হলো। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সুড়ঙ্গ মধ্যে কি বিপদ যে ওৎপেতে বসে আছে কে জানে।

সুড়ঙ্গ মুখটা ছিলো বিরাট, অনায়াসে একটি হস্তী এ সুড়ঙ্গে প্রবেশে সক্ষম হবে। বনহুর সঙ্গে একটি টর্চ এনেছিলো, সে টর্চটি এ মুহূর্তে তার কাজে এলো। সুড়ঙ্গ মধ্যে ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছিলো। বনহুর টর্চের আলো ফেলে অগ্রসর হলো। সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করে মাটিতে টর্চের আলো ফেলতেই আশ্চর্য হলো সে, মাটিতে এখন কোনো পদচিহ্ন নেই শুধু গোলাকার গর্তের মত দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো বনহুর, গোলাকার দাগগুলো অন্য কিছু নয়—গরিলাটি এ সুড়ঙ্গ মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রবেশ করতে পারে না, তাই সে হামাগুড়ি দিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। গরিলার হাটুর দাগ ব্যস হস্তীপদ চিহ্নের আকার ধারণ করেছে।

বনহুর বুঝতে পারলো— গরিলা মহারাজ হামাগুড়ি দিয়ে এ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে থাকে। এ সুড়ঙ্গটাই তার বাসস্থান। অল্প কিছুটা অগ্রসর হতেই বনহুরের কানে একটা করুণ কান্নার শব্দ এসে পৌঁছলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

কান পেতে শুনতে— মানুষের কণ্ঠ বলেই মনে হলো তার—তবে কি শ্যালনের কণ্ঠ? নিশ্চয়ই তাই হবে, না হলে এই নির্জন পাহাড়িয়া অঞ্চলে মানুষ আসবে কোথা হতে।

বনহুর শব্দ লক্ষ্য করে দ্রুত অগ্রসর হলো।

কিন্তু বেশিদূর তাকে এগুতে হলোনা, অন্ধকারে গুটিশুটি মেরে সাদা মত কিছু নজরে পড়লো। টর্চের আলো ফেলতেই বনহুরের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হলো।

শ্যালনও আলো দেখে চোখ তুলে তাকালো, বনহুরকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলো—তারপর ছুটে এসে জাপটে ধরলো—আলম, তুমি এসেছো---আলম---আলম---

বনহুরকে আঁকড়ে ধরে শ্যালন থর থর করে কাঁপছে।

বনহুর শ্যালনকে বাম হস্তে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠে—ভয় নেই শ্যালন! চলো, শীঘ্র এখান থেকে পালাতে হবে।

আলম, গরিলাটা আবার এসে পড়বে না তো?

জানিনে, তবে তুমি শীঘ্র চলো।

বনহুর শ্যালনকে নিয়ে দ্রুত সুড়ঙ্গ মধ্য হতে বেরিয়ে আসতে লাগলো। সম্পূর্ণ দুটো দিন অনাহারে কাটানোর পর শ্যালন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, বনহুর ওকে বলিষ্ঠ হাতে ধরে রাখলো শক্ত করে।

সুড়ঙ্গ মুখে বেরিয়ে আসতেই একটা হুঙ্কার বনহুর আর শ্যালনের কানে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিলো।

শ্যালন বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো, পরক্ষণেই বনহুরের হাতের উপর ঢলে পড়লো।

গরিলা মহারাজ তখন একেবারে প্রায় এসে পড়েছে। বনহুর এ মুহূর্তে কি করবে ভেবে পায়না, সংজ্ঞাহীন শ্যালনের দেহটা হাতের উপর তুলে নিয়ে দ্রুত সরে দাঁড়ালো পাশের একটা ফাটলের মধ্যে।

গরিলার হুঙ্কার তখন আরও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে, তীব্র আর্তনাদ শোনা গেলো সুড়ঙ্গ মুখের বাইরে থেকে। বোধ হয় প্রফেসার ম্যাকমারার কোনো ছাত্র গরিলা রাজের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিলো। বনহুরের এখন অন্য কথা চিন্তা করার সময় নেই। গরিলার হাত থেকে নিজে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে শ্যালনকে।

বনহুর শ্যালনের দেহটা কাঁধে ফেলে দক্ষিণ হস্তে রিভলভার উদ্যত করে দাঁড়ালো। সমস্ত শরীর তার ঘেমে চুপসে উঠেছে। সুড়ঙ্গ মধ্যে একটা ভ্যাপসা গরম, তারপর শ্যালনের সংজ্ঞাহীন দেহটা তখন তার কাঁধে। বনহুর রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতিক্ষা করছে গরিলা মহারাজের।

এবার বনহুর লক্ষ্য করলো—সুড়ঙ্গ মুখ থেকে ডালপালা সব সরিয়ে ফেলেছে গরিলাটা, ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে সব এদিক—সেদিকে। একরকম গর্জন শোনা যাচ্ছে, ঠিক যেন মেঘের ডাক।

বনহুর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে তাকে মোটেই দেখা যাচ্ছেনা।

গরিলা এবার প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গ মধ্যে। একটা পাগলা হাতী যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। নিশ্বাসটা যেন ঠিক ঝড়ের মত মনে হলো।

বনহুর রিভলভার ঠিক রেখে প্রতিক্ষা করতে লাগলো। শ্যালন কাঁধে না থাকলে সে নিজেকে এতোটা বিপন্ন মনে করতোনা। শ্যালনের জন্যই তার যত চিন্তা হচ্ছিলো।

গরিলার দেহটা সুড়ঙ্গ মধ্যে হস্তির দেহের মত গড়িয়ে গড়িয়ে এগুচ্ছে। একটা উৎকট ফোঁস ফোঁস শব্দ ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে বনহুরের। ওটা গরিলা-রাজের নিশ্বাসের শব্দ বলেই মনে হলো তার।

সুড়ঙ্গ মধ্যে এতোক্ষণ তবু কিঞ্চিৎ আলোক রশ্মি প্রবেশে সক্ষম হচ্ছিলো, এবার গভীর অন্ধকার জমাট হয়ে এলো। বনহুর লক্ষ্য করলো—তার সম্মুখে মেঘের মত একটা গাঢ় অন্ধকার থ' মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ভোঁম্‌টা গন্ধ। গরিলা-রাজের দেহের গন্ধ বেশ অনুভব করলো বনহুর। ফাটলের মধ্যে যতদূর সম্ভব নিজেকে গোপন করে দাঁড়িয়ে রইলো।

গরিলাটা আরও কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হলো, এবার বোধ হয় সে শ্যালনকে খুঁজে চলেছে, বাম হস্ত দিয়ে গরিলা হাতড়াচ্ছে সুড়ঙ্গ মধ্যে।

বনহুরের পাশ দিয়ে চলে গেলো বার কয়েক হাতখানা। বনহুর ফাটলের মধ্যে এমনভাবে আত্মগোপন করে রইলো যাতে একটুও দেখা না যায়। এখনও বনহুরের কাঁধে শ্যালনের অজ্ঞান দেহটা পূর্বের মতই ধরা রয়েছে।

গরিলা মহারাজ এবার হুঙ্কার ছাড়ে, সমস্ত সুড়ঙ্গ মধ্যে থরথর করে কেঁপে উঠে। বনহুর বুঝতে পারে—শ্যালনকে খুঁজে না পেয়ে সে এমন করছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বনহুর প্রতিক্ষা করছে, না জানি আজ তার এবং শ্যালনের জীবনে এই শেষ মুহূর্ত কিনা।

গরিলা বার বার হাতড়ে ফিরছে, অন্ধকারে সে দেখতে পাচ্ছেনা বটে, কিন্তু হাত দিয়ে সে অনুভব করে দেখছে মেয়েটিকে। সে যেখানে রেখে গেছে সেখানে আছে কিনা। ক্রমেই গরিলার রাগ চরমে উঠলো। পিছু হটে সে সুড়ঙ্গ মধ্য থেকে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

বনহুর এবার হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো।

শ্যালনের সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে নিলো দু'হাতের উপর, তারপর শ্যালনকে কোলের উপর শুইয়ে দিয়ে বসে পড়লো।

বাইরে তখন গরিলা মহারাজ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে, সুড়ঙ্গ মুখের বাইরে যেন ভীষণ ভাবে ঝড় শুরু হয়েছে। গাছপালা ভেংগে পড়ার মড় মড় শব্দ, বড় বড় পাথর ছুড়ে ফেলার গুম্ গুম্ আওয়াজ আর তার সঙ্গে গরিলার কণ্ঠের গর্জন। দুর্বল হৃদয় মানুষ হলে এতোক্ষণ সে শ্যালনের মতই অজ্ঞান হয়ে পড়তো।

বনহুরের হৃদয় কঠিন, লোহার চেয়েও শক্ত তার মন—সামান্যে ভীতু হবার বান্দা সে নয়। সে জানে, গরিলা মহারাজ আর ফিরে গুহামধ্যে আসবেনা। মনে পড়লো সঙ্গী-সাথীদের কথা, প্রফেসার ম্যাকমারার অন্যান্য ছাত্রদের কথা। না জানি বেচারীদের অবস্থা কি হয়েছে। সুড়ঙ্গ মুখেই ওরা অপেক্ষা করছিলো--

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, শ্যালন নড়ে উঠে ধীর মৃদু কণ্ঠে বলে —কে—কে তুমি?

বনহুর শ্যালনের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—শ্যালন আমি। আমি আলম।

শ্যালন বনহুরকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে—গরিলাটা কোথায়?

ভয় নেই শ্যালন, গরিলা মহারাজ বাইরে চলে গেছে।

ও কিসের শব্দ? সুড়ঙ্গ মুখ থেকে তখন ভীষণ আওয়াজ আসছিলো। সে আওয়াজ শুনে শ্যালন কম্পিত কণ্ঠে কথাটা জিজ্ঞাসা করলো বনহুরকে।

বনহুর শ্যালনের হাতখানা দক্ষিণ হস্তে ধরে বললো—গরিলাটা সুড়ঙ্গ মধ্যে তোমাকে না পেয়ে ক্ষেপে গেছে।

তাহলে উপায়?

আর আসবেনা বলেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমার বড্ড ভয় হচ্ছে, আবার যদি আসে---

ভয় করোনা শ্যালন, আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোমার কোনো চিন্তা নেই। গরিলা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা।

আলম, তুমি আমার বন্ধু।

হাঁ শ্যালন, আমাকে বন্ধু বলেই মনে করো।

শ্যালন বনহুরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো তার গণ্ডদ্বয়, আবেগ ভরা গলায় ডাকলো—আলম! বন্ধু!

বনহুরের শিরায় শিরায় জেগে উঠলো তার পৌরুষত্বভাব, কিন্তু সে নিজেকে পাষাণের মত সংযমী করে রাখলো। যদিও তার হৃদয়ে একটা উন্মত্ত উন্মাদনা ভীষণভাবে আলোড়ন জাগাচ্ছিলো তবু সে এতোটুকু বিচলিত

হলোনা। ধীরস্থির গম্ভীর গলায় বললো—শ্যালন, এর বেশি তুমি আমার কাছে কিছু পাবে না।

বনহুরের কথাটা শ্যালন ঠিক বুঝলো কিনা সন্দেহ, তার মুখো ভাবের কোনো পরিবর্তন এলো কিনা তাও দেখা গেলোনা গাঢ় অন্ধকারে।

বাইরে তখন গরিলা মহারাজের প্রচণ্ড দাপট থেমে এসেছে। বোধ হয় গরিলাটা চলে গেছে তার ছোট্ট মেয়েটির সন্ধানে।

বনহুর বললো—শ্যালন, গরিলা মহারাজ বোধ হয় সরে গেছে। চলো এবার পালাই।

আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে। বাইরে বেরুলেই যদি আবার সে আমাকে ধরে ফেলে?

অবশ্য শ্যালনের কথাটা মিথ্যা নয়, আরও কিছুটা সময় তাদের অপেক্ষা করা উচিৎ এখানেই। যদিও বনহুরের কাছে এই মুহূর্তগুলো অত্যন্ত অপ্রতিভ মনে হচ্ছিলো তবু বাধ্য হলো সে কিছু সময় এই অন্ধকারে আত্মগোপন করতে।

❑

বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পর বনহুর আর শ্যালন সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এলো। সুড়ঙ্গমুখ এখন ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ঢাকা নেই। গরিলা সব ডালপালাগুলো ক্রুদ্ধ হয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো অদূরে, বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো—অদূরে একটা গাছের গুড়ির পাশে পড়ে আছে তাদেরই দলের একজন যুবক।

বনহুর শ্যালনকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—শ্যালন দেখো।

শ্যালন ওদিকে তাকিয়ে ছুটে গেলো—সর্বনাশ! আমাদের লোক!

বনহুরও ততক্ষণে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে যুবকের দেহটার পাশে। যুবকটার মাথা থেতলে চ্যাপটা হয়ে গেছে। মুখ দেখে চিনবার জো নেই। দেহের বহুস্থানে ক্ষত, তখনও তাজা রক্ত ঝরছে মৃতদেহটা থেকে।

শ্যালন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

বনহুর বললো—হতভাগ্য গরিলার হস্তে জীবন দিয়েছে।

শ্যালন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর বুঝতে পারলো—শ্যালনের কোমল মনে আঘাত লেগেছে। এ দৃশ্য সে সহ্য করতে পারছেনা। তাড়াতাড়ি শ্যালনকে নিয়ে সরে এলো বনহুর, অন্যান্য সঙ্গীদের অন্বেষণ করতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেই পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনকে আবিস্কার করে ফেললো বনহুর। ভয়ে সবাই আড়ষ্ট হয়ে লুকিয়ে ছিলো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে। একজনের মৃত্যু হয়েছে, আর একজনকে পাওয়াই গেলোনা। বনহুর শেষ পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন চার নম্বর ব্যক্তির সন্ধান পেলোনা তখন আর বিলম্ব করা উচিৎ মনে করলোনা। তিন জন সঙ্গীসহ শ্যালন আর বনহুর ফিরে চললো তাদের তাবুতে।

অতি সতর্ক এবং সাবধানে ওরা চলছে, না জানি আবার কোন্ দণ্ডে তাদের সম্মুখে কোনো বিপদ এসে পড়বে। কিংবা গরিলা মহারাজা এসে হামলা চালাবে। শ্যালন বনহুরের পাশে পাশে চলতে লাগলো।

প্রফেসার ম্যাকমারার ছাত্রদ্বয় এমনভাবে চলছে তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝা যাচ্ছেনা। ওদের মুখ কালো বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। দু'দজন সঙ্গীকে হারিয়ে মনের অবস্থা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

পথে তেমন কোনো বিপদে আর পড়লোনা।

বেলা শেষে বনহুর ফিরে এলো শ্যালন ও সঙ্গীদ্বয়কে নিয়ে।

প্রফেসার ম্যাকমারা সেই ভোর হতে একটিবার আসন গ্রহণ করেন নি, সদা বিলাপ করে চলেছেন। শ্যালন তার জীবনের চেয়েও বেশি আদরিণী। একমাত্র কন্যা শ্যালনকে হারিয়ে তিনি উন্মাদ প্রায় হয়ে পড়েছেন।

শ্যালনকে ফিরে পেয়ে প্রফেসার আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলেন। কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে শপথ করলেন। আমার জীবনের এই শেষ আবিস্কার চেষ্টা। আর কোনোদিন আমি নতুন কোনো জীবের সন্ধানে গহন বনে প্রবেশ করবোনা।

তাবুর অন্যান্য সবাই মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর একটি দিনও তারা আফ্রিকার জঙ্গলে কাটাতে রাজী নয়। প্রফেসার ম্যাকমারার সখও মিটে গেছে ভালভাবে। ম্যাকমারা আফ্রিকার জঙ্গল ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, রাত্রিটা তাদের এখানেই কাটাতে হবে। কিন্তু যদি—গরিলা তার ছোট্ট মেয়েটির সন্ধানে আবার তাবুতে হানা দিয়ে বসবে না তো?

প্রফেসার ম্যাকমারা বললেন—কাল ভোরেই আমরা আফ্রিকা জঙ্গল ত্যাগ করে চলে যাবো। জঙ্গলের দক্ষিণ অঞ্চলে বাইরে সাগরবক্ষে ম্যাকমারার জাহাজ অপেক্ষা করছে।

কিন্তু আজ রাতটা কাটবে কি ভাবে কে জানে!

ম্যাকমারা কন্যাকে নিয়ে বেশি চিন্তায় পড়লেন। বনহুরকে তিনি কি ভাবে যে কৃতজ্ঞতা জানাবেন ভেবে পাচ্ছেন না। একবার—নয় দু'বার মৃত্যুর মুখ থেকে শ্যালনকে রক্ষা করে এসেছে আলম।

ম্যাকমারা কন্যাকে ছেড়ে দিলেন আলমের হাতে; তিনি বললেন —আলম, আমার শ্যালন তো তোমার। ওকে রক্ষা করেছো তুমি। বার বার মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছো। আজ রাতেও আমি শ্যালনকে তোমার জিম্বায় দিলাম। বাবা আলম, তুমিই ওকে যদি বাঁচাতে পারো।

বনহুর কোনো জবাব দিতে পারেনা।

কিন্তু রাতের বেলায় বাধ্য হলো বনহুর শ্যালনকে নিজের বিছানায় আশ্রয় দিতে।

প্রফেসার ম্যাকমারা ভয়ানকভাবে ভয় পেয়ে গেছেন। দলের একটি নয়, দুটি নয়, তিন তিনজনকে হারিয়েছেন তিনি। নতুন আবিস্কারের স্বপ্ন তাঁর অন্তর থেকে উধাও হয়েছে জন্মের মত। রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সান্তনা হচ্ছেনা। অস্থির চিত্ত নিয়ে তিনি তাবুর মধ্যে পায়চারী করছেন।

অন্যান্য সকলে বসে বসে ঝিমুচ্ছে, সকলের মধ্যেই একটা ভীত আতঙ্কভাব ভাব ফুটে উঠেছে। কারো মুখে কোন কথা নেই, সমস্ত তাবুর মধ্যে বিরাজ করছে একটা নিস্তব্ধতা।

বনহুর তার বিছানার এক কোণে বসে আছে, পাশে পড়ে রয়েছে গুলোভরা রিভলভার। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে। বিছানায় ঘুমিয়ে আছে শ্যালন। একরাশ সোনালী চুলের ফাঁকে শ্বেত পঙ্খীর মত শুভ্র সুন্দর একখানা মুখ।

বনহুরের দৃষ্টি এক সময় তার অজ্ঞাতেই চলে গেলো ঘুমন্ত শ্যালনের মুখে। চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনা সে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকে। সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করে সে, তারপর দক্ষিণ হাতখানা রাখে শ্যালনের কোমল নরম চিবুকের উপর। চুলগুলো আলগোছে সরিয়ে দেয় আঙুল দিয়ে।

আবার ফিরে তাকায় সে তাবুর একপাশে যেখানে ভীত দুর্বল ছাত্রগণ জড়ো-সড়ো হয়ে গুমটোমেরে শুয়ে আছে। বড় অসহায় বলে মনে হয় ওদেরকে।

রাত গভীর হতে গভীরতর হয়ে আসছে।

তাবুর বাইরে নানা রকম জীব-জন্তুর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসছিলো।

আজ ক'দিন প্রফেসার ম্যাকমারার চোখে ঘুম নেই। গত দুদিন তিনি সব সময় কন্যার জন্য কাঁদা-কাটা করেছেন। আজ তিনি বড্ড ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, তবু হুসিয়ারীর সঙ্গে পাহারা দিচ্ছেন যাতে কোন ক্রমে তার কন্যা বিপদগ্রস্ত না হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাকমারা আর পারলেন না, নিদ্রা দেবী তার দু'চোখে এসে ভর করলেন। তিনি তাবুর সঙ্গে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালেন, চোখ দুটো ধীরে ধীরে মুদে এলো।

সমস্ত তাবু জুড়ে একমাত্র জেগে রয়েছে বনহুর।

প্রফেসার ম্যাকমারা তাবুর সঙ্গে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, কিন্তু কতক্ষণ এভাবে ঘুমাবেন—এক সময় বসে পড়লেন মাটির মধ্যে এবং তাবুতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বনহুর লক্ষ্য করলো ম্যাকমারা নিদ্রার কোলে হেলে পড়লেন। তাবুর অন্যান্য সবাই ঘুমাচ্ছে। তার পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে মিস শ্যালন। বনহুর উঠে দাঁড়ালো দক্ষিণ হস্তে রিভলভারটা শক্ত করে ধরে পায়চারী করতে লাগলো। এক সঙ্গে সবাই ঘুমালে চলবে না, জেগে তাকে থাকতেই হবে। যদিও বনহুরের দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিলো, তবুও সে সজাগ হয়ে পাহারা দিতে লাগলো।

বার বার হাই উঠছে, বনহুর শ্যালনের উদ্ধারের জন্য দুদিন যা পরিশ্রম করেছে তা অবর্ণনীয়। পা দু'খানা ক্লান্তি আর অবসাদে যেন নুয়ে পড়ছে।

বনহুর একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ শ্যালনের তীব্র চীৎকারে চমকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার ম্যাকমারা এবং অন্যান্য সবাই জেগে উঠলো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই দেখলো বিরাট একখানা হাতের মুঠায় শ্যালনের দেহটা চোখের পলকে অদৃশ্য হলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাবু থেকে বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু অন্ধকারে তখন অনেক দূরে চলে গেছে গরিলাটা শ্যালনকে নিয়ে।

হতাশ হয়ে বনহুর ফিরে এলো তাবুর মধ্যে।

ম্যাকমারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন মাটি, ধুলো, বালির মধ্যে কণ্ঠ দিয়ে তার কোনো শব্দ বের হচ্ছেনা। অন্যান্য সবাই ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো কিছু করবার উপায় নেই।

আজ বনহুর নিজেও হতবাক হয়ে পড়েছে। কি বলে সে সান্তনা দেবে প্রফেসার ও তার ছাত্র দলকে।

ম্যাকমারা বনহুরকে স্নেহ করতো বলে প্রথম প্রথম দলের সবাই বনহুরকে ঈর্ষা করতো, কিন্তু এখন সবাই তাকে সমীহ করে। বনহুরই যেন এখন ওদের ভরসা।

ভোর হলেই তারা রওয়ানা দেবে ভেবেছিলো কিন্তু হলোনা, সব পণ্ড হয়ে গেলো। প্রফেসার ম্যাকমারা আর দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি মাটির মধ্যে পড়ে গড়া গড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কিছু সময় কেটে গেলো, কারো চোখে ঘুম নেই।

হঠাৎ একটা খক্ খক্ শব্দে সবাই আবার সচকিত হয়ে উঠলো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অস্ত্র বাগিয়ে ধরলো।

শব্দটা ঠিক কোন লোক যেন খক্ খক্ করে কাশছে সে রকম বলে মনে হলো। অদ্ভুত এ শব্দ। বনহুর তাবুর বাইরে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতেই প্রফেসার ম্যাকামারা তাকে জাপটে ধরলেন—যেওনা বাবা আলম, ওটা ভয়ঙ্কর জীব। আমি ঐ জীবের ছবি নিয়েছি, আর সে ছবি সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার পুত্র সমতুল্য একছাত্র তার হস্তে নিহত হয়েছে।

কথাটা শুনে বনহুরের আরও ইচ্ছা জাগলো জীবটাকে দেখার, কিন্তু কি উপায়ে দেখবে বা দেখতে পারবে।

বনহুর তাবুর একটি ফাঁকে চোখ রেখে তাকালো, যদিও বাইরে ঘন অন্ধকার তবুও বোঝা গেলো জীবটা অদ্ভুত দেখতে। বিরাট উঁচু বলে মনে হলো। মাথাটা কুমিড়ের মাথার মত লম্বাটে। সম্মুখে দুটো হাত আছে। পিছনের পা দু'খানার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে জীবটা। বোধ হয় তাবুর মধ্যে মানুষের গন্ধ পেয়েছে।

বনহুর তাবুর ফাঁকে জীবটাকে লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করে ধরলো।

ম্যাকমারা উঠি পড়ি করে চেপে ধরলেন বনহুরের হাতখানা, চাপা কণ্ঠে বল্লেন—সর্বনাশ করোনা আলম।

বনহুর বললো—কেনো?

ও জীব অতি সাংঘাতিক, রিভলভারের গুলী ওর শক্ত চামড়া ভেদ করতে পারবেনা। বরং ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের তাবু ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। প্রফেসার ম্যাকমারা তাবুর মধ্যের সমস্ত আলো নিভিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন।

কয়েক জন মিলে চট্ পট্ তাবুর মধ্যের মশালগুলো বালি চাপা দিয়ে নিভিয়ে ফেললো।

জীবটা তখনও অদ্ভুত কাশির মত শব্দ করে চলেছে।

এবার আলোগুলো নিভে যেতে জীবটা যেন একটু ভড়কে গিয়েছে বলে মনে হলো।

প্রফেসার ম্যাকমারা বললেন—ঐ জীবটা অন্ধকারে একেবারে চোখে দেখেনা। দিনের বেলা আলো ছাড়া ও বাইরে বের হয়না।

বনহুর বললো—ভুল করে হয়তো বাইরে এসে পড়েছে। কিন্তু অতো বড় একটা জীব থাকে কোথায়?

প্রফেসার ম্যাকমারা জবাব দিলেন—মাটির নীচে বিরাট গর্ত তৈরি করে ঐ সব জীব বাস করে।

জীবটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বলে মনে হলো, কতকটা আস্বস্ত হলো তাবুর সবাই।

এক সময় ভোর হলো।

তাবুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই বনহুর লক্ষ্য করলো তাবুর আশে পাশে ভিজে মাটিতে অদ্ভুত এক ধরনের পায়ের ছাপ। গরিলার পদচিহ্নের কাছাকাছি এলোমেলো ভাবে ফুটে রয়েছে। বনহুর আশ্চর্য হলো, এমন পদচিহ্ন সে কোনোদিন দেখেনি।

কিন্তু এখন তাদের যে অবস্থা তাতে তার চিন্তা করার বা কিছু ভাববার সময় নেই। বনহুর আজ দলবল নিয়ে অগ্রসর হলো না, সে একাই রওয়ানা দিলো।

প্রফেসার ম্যাকমারা হতাশ ভাবে চেয়ে রইলেন, অন্যান্য সকলে আজ কেউ সাহসী হলোনা বনহুরের সঙ্গে গমন করতে।

সবাই ভীত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, আর এক মুহূর্ত কেউ থাকতে রাজি নয়। বনহুর বললো—আমি ফিরে না আসা অবধি আপনারা তাবুতে অপেক্ষা করুন।

তাবুর খাদ্যও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো, যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো তা শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পাউরুটি, শুকনো মাংস, প্যাটিজ সবগুলোরই প্রায় এক অবস্থা। একে বন্য হিংস্র জন্তুর ভয়, অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্য সব অখাদ্য হয়ে উঠেছে। ছাত্রগণ ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এমন সময় বনহুর আবার বেরিয়ে পড়লো মিস শ্যালনের উদ্দেশ্যে।

বনহুর গতকাল যে পথে অগ্রসর হয়েছিলো আজও ঠিক সে পথেই অগ্রসর হলো, যদিও সে বুঝতে পেরেছে আজ শ্যালনকে নিয়ে গরিলা আগের দিনের সেই গুহায় যায়নি। অবশ্য বনহুরের সন্দেহ গরিলা পূর্বের দিনের সাবধানতার চেয়ে আজ অন্যভাবে সে সতর্ক হয়েছে। কিন্তু বনহুর গরিলার চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত। গরিলার জন্ম জঙ্গলে, আর বনহুরও মানুষ হয়েছে জঙ্গলে। জঙ্গল দেখলেই বনহুরের মনে আনন্দ হয় বেশি। হিংস্র জীব-জন্তু বনহুরের যেন সহচর। ভয়ের চেয়ে ওদের বেশি ভালবাসে সে, মনে হয় ওরাই যেন তার আপন জন।

আবার ওদের সঙ্গেই হয় তার লড়াই, এতে বনহুর দুঃখের চেয়ে বেশি তৃপ্তিবোধ করে, বড় বড় হিংস্র ব্যাঘ্র বা সিংহের সঙ্গে লড়াই করার পর যখন সে তাদের পরাজিত করে ঘর্মাক্ত কলেবরে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন সে রাজ্য জয়ের মত আনন্দ উপভোগ করে।

অদ্ভুত চরিত্র বনহুরের। সে মানুষের মত মানুষ—পুরুষের মত পুরুষ।

বনহুর শপথ গ্রহণ করেছে শ্যালনকে সে উদ্ধার করবেই করবে। বন জঙ্গল ভেদ করে সে অগ্রসর হচ্ছে। চারদিকে তার নিপুণ দৃষ্টি। বাম হস্তে টর্চ ও দক্ষিণ হস্তে রিভলবার, কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ্ণ ধারাল ছোরা।

দেহে মজবুত শিকারীর ড্রেস, পায়ে বুট, মাথায় ক্যাপ; মাঝে মাঝে প্যান্টের পকেট থেকে দূরবীন বের করে চোখে লাগিয়ে দেখছিলো সে।

তাদের তাবু ছেড়ে বেশ অনেক দূরে চলে এসেছে বনহুর।

একটা উচু মত জায়গায় দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দূরে লক্ষ্য করছিলো, হঠাৎ তার পিছনে বিরাট কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করলো, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়ালো বনহুর, কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়েই সে অবাক হলো। বিরাটা একটা অজগর তার দেহটা সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ধরেছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একটা অজগর বনহুরের পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করে ফেলেছে। টিলাটার পাশেই জঙ্গলে ছিলো সে, বনহুর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো সে সুযোগে সর্পরাজ সুযোগ করে নিয়েছেন।

অজগর বনহুরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলো যে একটু, নড়তে পারছে না। বনহুরের হাত দুখানাও সর্পরাজের দেহের আবেষ্টনীতে আটকা পড়ে গেছে।

অল্পক্ষণেই বনহুর পড়ে গেলো মাটিতে।

অজগর আর বনহুরের মধ্যে চললো ভীষণ ধস্তা-ধস্তি। বনহুর তার দক্ষিণ হাতখানা বের করে নেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু অজগরটা পূর্বের সেই অজগরের চেয়ে দ্বিগুণ আকার হবে। তার দেহেও ছিলো অসীম বল। বনহুর যেন আর পেরে উঠছিলো না।

ঠিক সেই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা আওয়াজ তার কানে এলো। যেন ডিজেল ইঞ্জিনের হুস্ হুস্ শব্দের মতই মনে হলো। বনহুর আর সর্পরাজ তখনও সমানে লড়াই করে চলেছে। বনহুরের ইচ্ছা থাকলেও দেখবার উপায় নেই, যুদ্ধ করছে বটে কিন্তু কান তো আর বন্ধ নেই। বনহুর শুনতে পাচ্ছে শব্দটা ক্রমান্বয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে, সে কি ভীষণ শব্দ! সত্যিই কি তবে কোনো ডিজেল ইঞ্জিন পথ ভুল করে আফ্রিকার জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।

শব্দটা অতি নিকটে মনে হলো। বনহুরের কানে যেন তালা লেগে আসছে। সে কি ভীষণ আওয়াজ।

আচমকা একটা অনুভূতি অনুভব করলো বনহুর, সর্পরাজের নাগপাশ থেকে সে মুহূর্তে মুক্তিলাভ করলো। সর্পরাজ ট্রেনের হুইসেলের মত একটা তীব্র আওয়াজ করে ফিরে দাঁড়ালো।

বনহুর তখন ভীষণ হাঁপিয়ে পড়েছে, সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তার নির্ভীক প্রাণ শিউরে উঠলো। অদ্ভুত একটা জীব তার বিরাট দেহ নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। জীবটার পা বলতে কিছু নেই, হাতও নেই, দেহটা একটা মস্তবড় শাল বৃক্ষের গুড়ির মত গোলাকার লম্বায় প্রায়

দু'শো হাতের বেশি হবে। মুখ বা মাথাটা একটা জালা বা ড্রামের মত; দু'পাশে দুটো সাদা ধপ ধপে সুতীক্ষ্ণ দাঁত বেরিয়ে আছে, আগুনের গোলার মত দুটো চোখ, মাথাটা চ্যাপটা ড্রামের তলার মত সেকি অদ্ভুত জীব, নাকের দুটো ছিদ্রি যেন দুটো উনুনের গর্ত। সেই বিরাট চোঙ্গের মত ছিদ্র দিয়ে ডিজেল ইঞ্জিনের মত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গরম হাওয়া বের হচ্ছিলো।

সর্পরাজ বনহুরকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পালাতে গেলো, কিন্তু অদ্ভুত জীবটা সর্পরাজের পিছন দিকটা তার জালার মত মুখে চেপে ধরলো।

বনহুর কিছুদূর দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে, সে আশ্চর্য হলো অদ্ভুত জীবটার কার্য কলাপ দেখে। সর্পরাজের লেজটা চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সাপটা আর একচুলও এগুতে পারলোনা, ছটফট করতে লাগলো সাপটা। বনহুর বুঝতে পারলো—সর্পরাজের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তি রাখে জীবটা তার দেহে। আরও অবাক হলো বনহুর জীবটা ক্রমান্বয়ে সর্পরাজকে মুখের মধ্যে টেনে নিচ্ছে।

সর্পরাজ জীবন রক্ষার জন্য ভীষণভাবে ছটফট করতে লাগলো। জীবটার নিশ্বাসে বনহুরের মনে হলো আশে পাশে ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কানফাটা ডিজেলের শব্দ।

বনহুর হতবুদ্ধির মত এই অদ্ভুত জীব দুটির কার্য লক্ষ্য করতে লাগলো। একটু পূর্বে যে সর্পরাজ তাকে গ্রাস করার জন্য কি সংগ্রামই না শুরু করে ছিলো, এখন তাকেই গ্রাস করতে চলেছে আফ্রিকার জঙ্গলের এক অজানা ভয়ঙ্কর জীব।

বনহুরের হৃদপিণ্ড ধক্ ধক্ করছে, সে দুর্দান্ত হতে পারে কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক জীব সে কোনো দিন দেখেনি। একটা ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বনহুর দেখছে শেষ পর্যন্ত সর্পরাজের ভাগ্যে কি হয়।

বিস্ময়ের ধাপ আরও চরমে উঠলো বনহুরের, যখন সে নিজের চোখে দেখলো সর্পরাজের সমস্ত দেহটা অদ্ভুত জীবটার উদর মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেকি ভীষণ মুখ গহ্বর! সর্পরাজের দেহটা যেন কোথায় উড়ে গেলো।

জীবটা এবার একটু ঝাকুনি দিয়ে নড়ে উঠলো, বোধ হয় সর্পরাজের বিরাট দেহটাকে তার উদর মধ্যে গুছিয়ে গোলা করে নিলো।

বনহুরের দুচোখে রাজ্যের বিস্ময়, জীবটা আবার গড়াতে গড়াতে চলে গেলো গহন বনের মধ্যে। জীবটার নাসিকার ডিজেল ইঞ্জিন ধরনের শব্দ সমস্ত বনভূমিকে কম্পিত করে তুলেছে।

জীবটা অদৃশ্য হতেই বনহুর ঝোপের মধ্যে হতে বাইরে বেরিয়ে এলো। হাঁফ ছেড়ে যেন নিশ্বাস নিলো। অদ্ভুত জীবটাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো সে।

বনহুর হাতঘড়িটা দেখে নিলো, সর্পরাজের কবল থেকে নিজেকে সে আজ উদ্ধার করতে পারতো কিনা সন্দেহ। এসবে তার প্রায় তিন ঘন্টা কেটে গেছে, বনহুর আবার দক্ষিণ হস্তে রিভলভার চেপে ধরে অগ্রসর হলো।

❑

সন্ন্যাসী বাবাজী ওর পিঠে হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে বললো—মা, আজও তুই তোর পরিচয় আমাকে জানালিনা? জানিনা কে তুই, কোথায় তোর ঘর----

বাবাজী, তুমি আমাকে মা বলে ডাকো—এই তো আমার পরিচয়। তোমার মত পুত্রের মা হবার সৌভাগ্য কি আমি আমার তুচ্ছ নামের আড়ালে ঢাকা ফেলতে পারি।

বেশ তুই যা ভাল মনে করিস তাই হবে। তবে জানিস মা আমার মত বুড়ো ছেলের মা হয়ে চিরদিন কাটাতে পারবিনা।

কেনো, কেনো বাবাজী?

এই কচি নতুন বয়স, বুড়ো ছেলের মা হয়ে নষ্ট করে দিবি?

বাবাজী, তুমি তো জানো—আমি বয়সে কচি হলেও মন আমার কচি নয়। এ বয়সে আমার জীবনে এসেছে কত পরিবর্তন, কত ব্যবধান। আমি নামে মাত্র বেঁচে আছি, জীবনে আমি মৃত।

মা!

বলো, আমায় মা বলে ডাকো বাবাজী।

মা, আর তোকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে মনঃকষ্ট দেবোনা। বেশ, তুই তোর বুড়ো ছেলের মা হয়েই থাক। চলে গেলো সন্ন্যাসী বাবাজী।

যুবতী হঠাৎ আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। দু'চোখে নেমে এলো অশ্রুর বন্যা।

এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ালো আশ্রমের এক যুবক, নাম ওর কেশব। কেশব ডাকালো-ফুল!

চোখ তুলে তাকালো যুবতী—কেশব ভাই!

ফুল কান্নাই কি তোমার সাথী?

হাঁ, কেশব ভাই।

অতো কাঁদলে তুমি বাঁচবে কি করে ফুল?

কাঁদতে পাই বলেই বেঁচে আছি আজও।

ফুল, বাবাজী তোমাকে কি বললেন?

আমার পরিচয় তিনি জানতে চান।

হাঁ, তোমার পরিচয় শুধু তিনি নন, আমরাও জানার জন্য সর্বক্ষণ উৎসুক হয়ে রয়েছি। কিন্তু জানি নে, তোমার পরিচয় কেন তুমি গোপন রাখো?

আমার কোনো পরিচয় নেই। আর যে পরিচয় আছে তা বলে আমি নিজকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না।

ফুল, সব সময় তুমি শুধু হেঁয়ালী ভরা কথা বলো। তোমার কথা কিছুই আমরা বুঝতে পারি নে। কে তুমি, কোথায় তোমার ঘর, কি তোমার পরিচয়?

কেশব ভাই!

না, আমি তোমার কেশব ভাই নই। ফুল, আমাকে তুমি শুধু কেশব বলে ডাকবে।

আশ্চর্য হয়ে তাকায় ফুল কেশবের মুখে।

কেশব বলে চলে—ফুল, আমি তোমাকে ভালবাসি---

কিন্তু জানো না আমাতে তোমাতে কত প্রভেদ।

আমি জানতে চাইনে কোন কথা। ফুল, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে আমি বিয়ে করবো!

তা হবার নয়।

আমিই তোমাকে খুঁজে পেয়েছি, আমিই তোমার জীবন রক্ষা করেছি-

তবুও সম্ভব নয়।

ফুল!

হাঁ।

কিন্তু কতদিন তুমি আমার কাছ থেকে সরে থাকতে পারবে?

যতদিন তোমার মন সচ্ছ না হবে।

ফুল!

জানি তুমি কি চাও কেশব ভাই।

আবার তুমি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করছো?

তুমি আমার জীবন রক্ষা করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছো, কাজেই তোমাকে আমি কোনোদিন অশ্রদ্ধা করতে পারবোনা।

তাই বুঝি?

হাঁ, আমার অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে তোমাকে ভাই-এর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছি। কেশব ভাই, তুমি---

ভাই-ভাই-ভাই---ও শব্দ আমি শুনতে পারিনে। আমাকে তুমি কিছু বলে ডেকোনা।

তুমিও আমাকে ফুল বলে আর ডেকোনা। যদি ডাকো— বোন বলে ডেকো। ফুল আমার নাম নয়।

ফুলের মত তুমি সুন্দর, তাই আমি তোমাকে ফুল বলে সম্বোধন করেছিলাম, কিন্তু ---

কিন্তু কি? কি বলতে চাও তুমি?

কিন্তু সে নামের মর্যাদা তুমি রাখলেনা।

আমি ফুল নই, কাজেই ফুলের মর্যাদা আমি চাইনে।

এমন সময় সন্ন্যাসী বাবাজীর আবির্ভাব হয়, ডাকে সে—মা।

বাবাজী!

তোমাদের আবার কি হলো মা?

কেশব দ্রুত চলে যায়।

সন্ন্যাসী বাবাজী বলেন—আমার কাছে লুকোসনে মা। জানি কেশব তোকে ভালবেসে ফেলেছে, তাই সে---

বাবা!

মা, সে যদি আজ তোকে না রক্ষা করতো তাহলে জীবনে বেঁচে থাকতে পারতিস্ নে।

বাবাজী---

জানি, সব জানি, কিন্তু কেশবকে তুই বিমুখ করতে পারিস্নে। সে পুরুষ—তুই নারী। মা, আমি তোর সন্তান, তবু বলছি, বলতে বাধ্য হচ্ছি—তোদের উভয়েরই প্রয়োজন উভয়কে।

বাবাজী—বাবাজী—।

জানি তোর লজ্জা, আমি সন্ন্যাসী—আজীবন নারী জাতিকে আমি মায়ের আসনে স্থান দিয়ে এসেছি। তবু আমি বলছি, তোরা দু'জন দু'জনাকে বিয়ে করে সুখী হবি।

তা সম্ভব নয় বাবাজী। তা সম্ভব নয়--

কেন মা?

বাবাজী।

বসো মা, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

যুবতী বসলো সন্ন্যাসীর পাশে।

সন্ন্যাসী বাবাজী ইতোপূর্বে আসন গ্রহণ করেছিলেন, এবার তিনি বললেন—মা, আজ প্রায় বছরের বেশি হয়ে এলো তুই এসেছিস আমার আশ্রমে, কিন্তু আজও তুই মনের কথা আমাকে খুলে বলিস্ নি। আমিও তেমন করে জানতে চাইনি, কারণ যখনই তোকে তোর পরিচয় জানাতে বলেছি বা চেয়েছি তখনই তোর চোখে-মুখে আমি দেখেছি এক গভীর

বেদনার ছাপ—তাই আর কোনো প্রশ্ন করার সাহস আমার হয়নি। একটু থেমে পুনরায় বললেন সন্ন্যাসী —জানিনে কে মা তুই? কোথা হতে এসেছিলি? কি করেই বা তোর এ অবস্থা হয়েছিলো?

বাবাজী আজ আমি সব তোমাকে খুলে বলবো, কিন্তু তারপর তুমি আমাকে আর এক তিল এখানে রাখবেনা।

ছিঃ মিছেমিছি ওসব চিন্তা করছিস কেন মা?

বাবাজী, আমি বড় অসহায়!

তাইতো তোকে আমি আমার মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

তাহলে কেন তুমি বার বার ঐ কেশবের কথা বলো বাবাজী?

মা—এই কচি বয়স, সুন্দর ফুলের মত একটি জীবন এভাবে নষ্ট করে দিবি? তাছাড়া কেশব মন্দ ছেলে নয়। তার বংশ মর্যাদা, তার আত্ম-পরিচয়, তার সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, তার পৌরুষোচিত স্বভাব—সবই যে কোনো নারীর কামনার বস্তু। তাই আমি বলেছিলাম ওকে স্বামী বলে গ্রহণ করে তোরা সুখের সংসার বাঁধবি। জীবনে আমি যা পাইনি তা থেকে আমি কাউকে বঞ্চিত করতে চাইনে।

বাবাজী, তুমি যা বলছো আমি সব বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তা হবার নয়।

একই কথা আর কতদিন শোনাবি মা?

যতদিন আমি নিজের মনকে শান্ত করতে না পারবো।

মা, আজ তোকে বলতেই হবে।

কি বলবো বাবাজী?

তোর পরিচয়।

আমিতো বলেছি আমার কোনো পরিচয় নেই।

তা হয়না; মানুষ হয়ে জন্মেছিস্ অথচ পরিচয় নেই—এ কখনও হতে পারে!

অতি অশোভনীয় আমার পরিচয়--

আমি তোর পিতৃস্থানীয়, আমার কাছে এতো সঙ্কোচ কেন মা? জানিস্ মা, এই নির্জন গহন বনে আমি কি করে এলাম?

না বাবা, আমি জানিনে।

তবে আমার পরিচয়টা আগে শুনে রাখ।

যুবতী অবাক হয়ে শুনতে থাকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাবাজীর কথাগুলো।

সন্ন্যাসী বাবাজী বলেন—মা, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আমি আরাকান শহরের একজন নাগরিক ছিলাম। ধনকুবের শিবাজী রঘু নামে আমি শহরে পরিচিত ছিলাম। আমার কাজ ছিলো বাণিজ্য করা। দেশ-

বিদেশ থেকে আমার মাল আসতো, আর নিজের দেশের মাল চালান দিতাম। আমি বিভিন্ন দেশে সওদাগর বা বণিক হিসেবে আমি লোকের কাছে পরিচিত হলেও আস্লে সওদাগরি নামটা ছিলো আমার খোলস মাত্র; আসলে আমার ব্যবসা ছিলো পরের ধন লুটে নেয়া। জাহাজে আমার যে সব মাল দেশ-বিদেশে যেতো সেগুলো সত্যিকারের মাল থাকতো না আজে বাজে জিনিসে জাহাজ ভর্তি থাকতো। আর তার মধ্যে থাকতো আমার বিশ্বস্ত অনুচরগণ।

বাবা।

হাঁ মা, কিন্তু আজ আমি আর সেই তিরিশ বছর আগের শিবাজী রঘু নই--- হাঁ কি বলছিলাম মা? হাঁ, জাহাজ ভর্তি আমার অনুচর থাকতো, তাদের সঙ্গে থাকতো মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র। জল পথে আমার বাণিজ্য চলতো, কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ দেখলেই আমার ইংগিতে আমার অনুচরগণ তৈরি হয়ে নিতো। তারপর সেই জাহাজটিকে আক্রমণ করে, যাত্রীদের করা হতো নির্মমভাবে হত্যা, আর তাদের মালপত্র সব লুটে নেয়া হতো। ঐ সব মালপত্র আমার খালি জাহাজ ভর্তি হয়ে উঠতো। তারপর ফিরে চলতাম স্বদেশে। লোকে জানতো—সওদাগরি করে ফিরে এলাম--

যুবতীর চোখে-মুখে বিস্ময়, একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছেনা। নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সে সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখের দিকে।

সন্ন্যাসী বাবাজী বলে চলেন— একদিন একটা জাহাজ লুট করে নেবার সময় আমার অনুচরগণ একটি মহিলাকে হত্যা করে তার সন্তানটিকে কেড়ে নেয়, তারপর সে শিশুটিকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে তামাসা দেখবে বলে প্রস্তুত হয়ে নেয়। আমি সে মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হই, হৃদয়হীন পাষাণ হলেও এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারিনি। আমার অনুচরটির হাত থেকে শিশু সন্তানটিকে ছিনিয়ে নেই, শিশু আমাকে জড়িয়ে ধরে। মনে হয় সে আমর বুকে আশ্রয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমি তাকে হত্যা করতে পারিনে, নিয়ে আসি আমার আস্তানায়। পরে জানতে পারি, সে শিশুটি আরাকানের রাজবংশের ছেলে। কিন্তু আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি, তার মাকে আমরা হত্যা করেছি—কার কাছেই বা ফিরিয়ে দেবো। সে শিশুই আমার জীবনে আনে পরিবর্তন।

থামলেন সন্ন্যাসী বাবাজী, দু'চোখে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বহুদিন আগের দৃশ্যগুলো স্মরণ করে চললেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন —মা, বলতে যখন শুরু করেছি তখন সব বলবো। শিশুটিকে পেয়ে ভুলে গেলাম আমি আমার পাপ-কার্য। আমার অনুচরগণ আমার মধ্যে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লো। আমি তাদের মনোভাব

বুঝতে পেরে আশংকিত হলাম। আমার ভয় হলো, শিশুটিকে ওরা হত্যা করে না বসে। দল থেকে সরে রইলাম, গোপনভাবে শিশুটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দলের সমস্ত অনুচর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলো, তারা নতুন দলপতি বানিয়ে আমাকে পর্যন্ত নিহত করবার মতলব আটকে লাগলো।

যুবতীর মুখে কোনো কথা নেই, সে স্তব্ধ হয়ে শুনছে সন্ন্যাসী বাবাজীর কথাগুলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো সে—তারপর বাবাজী?

হাঁ মা, তারপর আমি শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য উতালা হয়ে উঠলাম, তার সঙ্গে নিজেকেও বাঁচাতে হবে। আমি একা আর আমার বিদ্রোহী অনুচরগণ প্রায় একশতেরও বেশি। শুধু সংখ্যায় তারা বেশি বলে নয়, তাদের আচরণ অতি নৃশংস, দয়া-মায়া বলে তাদের প্রাণে কিছু ছিলো না। যে কোনো মুহূর্তে আমাকে ওরা হত্যা করতে পারে। শিশুটিকে বাঁচাতে চাই বলেই তাদের কাছে আমি এতোবড় দূর্বল। মনের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করলাম, ভাবলাম কি হবে একটা শিশুর নাগপাশে বন্দী হয়ে। জীবনে কোনোদিন কাউকে ভালবাসিনি—বাসতে পারিনি, অর্থের লালসা আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিলো, অর্থই আমাকে দিয়ে ছিলো প্রাণ। তবু পারলামনা শিশুটির মায়ার কাছে আমি পরাজিত হলাম। অর্থ ঐশ্বর্য সব সরে গেলো, সব মোহ কেটে গেলো আমার শিশুটিকে বুকে পেয়ে। মা, বিয়ে আমি জীবনে করিনি। নারীকে আমি প্রথম জীবন থেকেই শ্রদ্ধা করতাম। মায়ের আসনে আমি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তাদের, তাই নারীকে ভালবেসেও আমি গ্রহণ করতে পারিনি। শিশুটিই আমার সব আশা পূর্ণ করেছিলো। ওর মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার জীবনের সব পাওয়া। মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে আমি ভুলে গেলাম আমার পাপ জীবন। আমি আমার পাপ কাজ উপার্জিত সব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে একদিন নিরুদ্দেশ হলাম। আমার সঙ্গী শুধু সেই শিশু সন্তান আর মাত্র কিছু খাবার। মা, সেই হতে আমি এ গভীর জঙ্গলে পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করে রইলাম। গাছের ফল আমার ক্ষুধা নিবারণ করে, আর ঝরণার পানি আমার পিপাসা নিবারণ করে। সে শিশুই আমার জীবনে এনেছিলো পরিবর্তন। আমি সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে সেই হতে এই গভীর জঙ্গলে বাস করছি। আমার সঙ্গী-সাথী এবং আমার অনুচরগণ আমার সন্ধান করেও আর আমাকে খুঁজে পায়নি।

যুবতী বলে উঠলো —সেই শিশু এখন কোথায় বাবা?

তিরিশ বছর আগের সেই শিশু আজও কি শিশু আছে মা। সে এখন যুবক, তার আগের সে কচি রূপ এখন আর নেই, সে হয়েছে একজন বলিষ্ঠ সুন্দর সবলদেহী পুরুষ।

তবে কি?

হ্যাঁ, মা সেই শিশুই আমার আজকের এই কেশব।

বাবাজী, আপনি সত্যিই অপরূপ মানুষ। আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি--

মা, তাই আমি তোর কাছে একটা দাবী জানাই। আমার কেশবকে গ্রহণ করে ওকে সার্থক কর মা, ওকে সার্থক কর।

বাবা, জানো না, তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কেন, কেন তা সম্ভব নয়? আমার কেশব কোনো হীন বা নীচু ঘরের সন্তান নয়। আমার কেশব অমূল্য সম্পদ।

বাবা, আমি আপনার কেশবের যোগ্য নই।

কেন, কিসে তুই যোগ্য নস মা?

আমার পরিচয় যদি জানতে তাহলে আমাকে তুমি কিছুতেই একথা বলতে না।

মা, তুই মানুষ—এইতো তোর বড় পরিচয়। এর বেশি আমার জানতে হবে না। তাছাড়া কেশব তোকে চায়—মা, আমি যে কেশবের জন্য সব মেনে নিতে পারি।

বাবা, আমি মুসলমান, একথা জেনেও---

সন্ন্যাসী বাবাজীর চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো, পর মুহূর্তে বললেন তিনি —একথা তুমি এতোদিন বলোনি কেন?

হয়তো আপনি আমাকে---

ত্যাগ করবো এই ভয়ে, না?

হ্যাঁ, আমি যখন জানতে পারলেম আপনারা ব্রাহ্মণ জাতি তখন আমার ভয় হলো—আমি মুসলমান কন্যা, আপনি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী। মাথা গুঁজবার একটু স্থান তবু পেয়েছি—তাও যদি হারিয়ে যায়, তাই--

তাই তুমি গোপন করে আসছো তোমার পরিচয়?

হাঁ।

কিন্তু একথা জানো না—সন্ন্যাসীদের কোনো বিশিষ্ট ধর্ম বলে কিছু নেই। তাদের কাছে সবাই সমান হিন্দু-মুসলমান -খ্রীষ্টান সব এক। তুমি মুসলমান বেশতো, তোমার ধর্ম তুমি মেনে চলবে, কেশব তার নিজের ধর্ম মেনে চলবে, তাতে কোনো দোষ নেই। আমি এখনই কেশবকে ডেকে তার মতামত জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি। এবার উচ্চ-কণ্ঠে ডাকলেন সন্ন্যাসী বাবাজী—কেশব--কেশব!

কক্ষে প্রবেশ করলো কেশব—বাবা!

কেশব তুমি বসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বাবা, আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। আমার জীবন ইতিহাস থেকে ফুলের জাতি ধর্ম সব শুনেছি।

সন্ন্যাসী শব্দ করে উঠলেন —সব শুনেছো?

হ্যাঁ বাবা। আমি কে, কি আমার পরিচয়—তুমি আমার কে, সব শুনেছি। বাবা—আমি জানতাম তুমি আমার পিতা, কিন্তু তুমি আমার পিতা নও, তবু তুমি আমার রক্ষক—পিতার চেয়েও বড় তুমি---

কেশব!

বাবা, এতোদিন তুমি আমার কাছে সব গোপন রেখে ভালই করেছো।

জানি নে ভাল করেছি কি মন্দ করেছি। অনেকদিন ভেবেছি তোর পরিচয় তোকে জানিয়ে তোর আত্মীয়-স্বজনের কাছে তোকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। কিন্তু তোর মায়া আমাকে সব কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে, তোকে আর ফিরিয়ে দিতে পারিনি।

এটাই তুমি ভাল করেছো বাবা! তোমার স্নেহময় বন্ধনে আমি মানুষ-জীবন লাভ করেছি। আমি খুঁজে পেয়েছি আমার জীবনটাকে। তোমার অনেক আপত্তি সত্ত্বেও আরাকানে আমি গিয়েছি। দেখেছি শহরের মানুষ নামের জীবগুলোকে। যাদের মানুষের মত সব আছে—নেই মানুষের মত প্রাণ। রাজবংশের ব্যক্তিদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটেছে—কিন্তু আমি তাদের আচরণে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। রাজবংশের জীব বলে তাদের যে অহঙ্কার, সে অতি সাংঘাতিক। মানুষকে তারা মানুষ বলে মানে না, তারা সবাইকে নগণ্য ঘৃণ্য জীব বলে মনে করে। অর্থ আর নারী পিপাসা তাদের অন্ধ করে ফেলেছে। বাবা আমি ওদের মনের পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠেছি, পালিয়ে এসেছি তাদের সংশ্রব থেকে। কি জঘন্য, কি সাংঘাতিক ওদের মনোবৃত্তি!

সন্ন্যাসী বাবাজীর চোখে মুখে বিস্ময়, অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন কেশবের মুখের দিকে! কথাগুলো বলতে গিয়ে কেশবের সুন্দর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে ওর। বললেন সন্ন্যাসী বাবাজী—ধন্য কেশব, ধন্য তুমি! আমার সাধনা সার্থক হয়েছে।

বাবা!

কেশব, তোমার আত্ম-পরিচয় পেলাম, এবার তোমার হৃদয়ের পরিচয় চাই। ফুলকে তুমিই গহন বন হতে কুড়িয়ে এনেছিলে। তোমার প্রচেষ্টায় সে জীবন লাভ করেছে। তুমিই ওকে বাঁচিয়েছো, কাজেই আমি ফুলকে তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিত হতে চাই। কিন্তু তার জাতি ধর্ম তোমার স্বজাতি নয়—সে মুসলমান কন্যা।

আমি সে কথাও শুনেছি—একটু পূর্বে ফুল যখন আপনাকে তার কথা জানাচ্ছিলো।

সে মুসলমান জেনেও তাকে বিয়ে করতে চাও?

হাঁ।

খুশি হলাম তোমার কথা শুনে কেশব।

মানুষ মানুষই—তার আবার জাতি ধর্ম কি?

❑

ফুল, আর কতদিন আমাকে এভাবে বঞ্চিত করবে?

কেশবের কথায় চমকে উঠলো ফুল, বললো আমি তোমার আশাকে কোনোদিন পূর্ণ করতে পারবো না। কেশব ভাই, আমি তোমার কাছে ঋণী...কিন্তু সে ঋণ শোধ করবার মত আমার কিছু নেই।

আমি শুধু তোমাকে চাই। ফুল, আমি আর কিছু চাই নে। বাবা বলেছেন তোমার-আমার বিয়ে হবে তাতে কোন বাধা নেই। তবে কেন, কেন তোমার এতো আপত্তি?

কেশব ভাই একটা কথা আমি আজ তোমাকে বলবো?

বলো?

কেশব ভাই, আমি জানি তুমি আমাকে রক্ষা না করলে হয়তো এতদিন আমি মিশে যেতাম মাটির বুকে। আমার কোনো অস্তিত্ব থাকতো না। আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট করেছো একথা আমি কোনোদিন অস্বীকার করবোনা বা করতে পারবোনা।

কিন্তু....

বলো—থামলে কেন?

বিয়ে আমি কোনোদিন করতে পারবোনা।

কেন?

কেশব ভাই, আমি বিবাহিত....

ফুল!

হাঁ, আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

কোথায় তোমার স্বামী? কে তোমার স্বামী?

জানিনে সে এখন কোথায়—জানিনে তার সন্ধান।

কে—কে তোমার স্বামী, ফুল? বলো, বলো কে তোমার স্বামী?

আজ নয়, বলবো—আরও পরে বলবো তার পরিচয়।

কেন কিসের জন্য তোমার স্বামীর পরিচয় তুমি গোপন রাখতে চাও?

তা—ও জানাবো পরে।

কিন্তু ফুল, বিয়ের নাম করে তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেনা। যদি সত্যিই তুমি বিবাহিত হও তবু তোমাকে আমি গ্রহণ করতে রাজী আছি।

তা হয়না।

ফুল, কেন তুমি নিজেকে এভাবে বিনষ্ট করছো? যাকে তুমি হারিয়েছো—তাকে আর কোনোদিন ফিরে পাবে কিনা সন্দেহ। সে এখন জীবিত না মৃত তাই বা কে জানে।

কেশব ভাই, ও কথা বলোনা। আমার মন বলছে সে জীবিত আছে।

ফুল, মনের কাছে তোমার এ দূর্বলতা শোভা পায়না। যদি সে জীবিতই থাকে ক্ষতি কি, সেতো আর এখানে ফিরে আসবেনা কোনোদিন। ফুল, এসো আবার আমরা নতুন করে ঘর বাঁধি? এই সুন্দর আকাশ, সুন্দর বাতাস, এই গহন বনের নিস্তব্ধতা, পাখির গান, ঝরণার কল কল ধ্বনি। সব আমরা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করি। বাবা এতে খুশি হবেন, আশীর্বাদ করবেন আমাদের দু'জনাকে। ফুল....

কেশব ফুলের হাতখানা ধরে ফেলে।

ফুল ওর বলিষ্ঠ হাতের মধ্য থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলে—কেশব ভাই, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে.....

না না শ্রদ্ধা আমি চাইনে, আমি চাই তোমাকে। ফুল, আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই চাইনে। তুমি মুসলমান; আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান, তবু আমি তোমাকে কোনো সময় ভিন্ন মনে করিনি। তুমি বিবাহিত জেনেও আমি তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবোনা, তুমি আমার নয়নের আলো।

কেশব ভাই, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমার হাত।

আগে কথা দাও তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

যা সম্ভব নয় কি করে তা হবে বলো, কেশব ভাই?

কেন কিসের জন্য সম্ভব নয়, তুমি বিবাহিত আর আমি অবিবাহিত, তাই?

না। আমি এর জবাব দিতে পারবোনা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে...ফুল কেশবের হাতের মুঠা থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

কেশব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফুলের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে।

কেশব কোনোদিন মেয়ে মানুষ দেখেনি, সে আজীবন এই গহন বনে পর্বতের গুহায় সন্ন্যাসী রঘু বাবাজীর আশ্রয়ে মানুষ। তার জীবনে ফুল নতুন

এক সৃষ্টি। ফুলকে সে যখন প্রথম দেখলো তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলো ভীষণভাবে। তার আর ফুলের মধ্যে সে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেছিলো পার্থক্যটা। ফুলকে সে আবিষ্কার করেছিলো এক নতুন আস্বাদ নিয়ে।

ফুলকে সে শিকার করতে গিয়ে বনের মধ্যে তীরবিদ্ধ অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিলো। অজ্ঞান ফুলকে কাঁধে বয়ে নিয়ে এসেছিলো সে আশ্রমে। প্রথমে ওকে মৃত মনে করেছিলো কিন্তু আশ্রমে নিয়ে আসার পর সন্ন্যাসী বাবাজী ওকে পরীক্ষা করে বলেছিলো—ওর মৃত্যু হয়নি, এখনও সে জীবিত। সন্ন্যাসী বাবাজী এবং কেশবের অক্লান্ত সেবা-যত্নে ফুল জীবন লাভ করেছিলো।

ফুলকে বাঁচাতে গিয়ে কেশব অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে।

সন্ন্যাসী বাবাজীর কথা মত তাকে বন হতে বনান্তরে গাছ-গাছড়া হতে ঔষধ সংগ্রহ করতে হয়েছে। ফুলের শরীর থেকে অত্যন্ত রক্তপাত হওয়ায় তাকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়েছিলো। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

কিন্তু কেশব হতাশ হয়নি, সন্ন্যাসী বাবাজী যা বলেছেন সে ভাবে সে কাজ করে গেছে। গহন বনে একরকম ফুল পাওয়া যায়। সে ফুল ভক্ষণ করলে শরীরে রক্ত জন্মে। কিন্তু সে ফুল সংগ্রহ করা অতি মারাত্মক ব্যাপার। রক্তপায়ী বৃক্ষেই জন্মে সে ফুল। কেশব মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সে ফুল সংগ্রহ করে আনতো, আর সন্ন্যাসী বাবাজী সে ফুলের রস তৈরি করে খাওয়াতো যুবতীকে।

এভাবে যুবতীর দেহে রক্ত সৃষ্টি করলো তারা। একদিন সত্য সত্যই যুবতী আরোগ্য লাভ করলো। কেশব ওকে অবাক হয়ে দেখতো, ভাল লাগতো ওর।

তারপর যুবতীর সান্নিধ্য কেশবকে নতুন এক জীবন দান করলো। সে নিজের মধ্যে অনুভব করলো পৌরুষচিত মনোভাব। যুবতীর নাম কেশবই রেখেছিলো ফুল। কারণ ফুলের রস খেয়েই ও বেঁচে উঠলো।

কিন্তু যুবতী বেঁচে উঠলেও সে তার পরিচয় জানালোনা সন্ন্যাসী বাবাজী বা কেশরের কাছে।

কেশবের মনে দাগ কাটলো ফুল। কেশব ওকে ভালবেসে ফেললো অত্যন্ত গভীরভাবে।

সন্ন্যাসী বাবাজী বুঝলেন, তিনি বাধা দিলেন না কেশবকে। কারণ তিনি নিজেও নিজের জীবনটাকে বিফল করে ফেলেছেন। কেশব যাতে তার জীবনটা শুষ্ক মরুর মত করে না তোলে সেজন্য তিনি লাগাম ছেড়ে দিলেন।

কেশব ইচ্ছামত ফুলের সঙ্গে মিশতো।

কেশব মিশতে চাইলেও ফুল সরে থাকতো কেশবের কাছ থেকে। কিন্তু কেশবের অবুঝ অন্তরের কাছ হতে সরে যেতে পারতোনা। সে জোর করে ওকে টেনে নিয়ে আসতো সন্ন্যাসী বাবার পাশ থেকে।

হাসতেন সন্ন্যাসী বাবাজী, ভাবতেন দোষ কি মিশতে—একদিন ওদের বিয়ে দেবেন মনস্থির করে নিলেন।

ফুল যখন জ্ঞান লাভ করেছিলো তখন সে প্রথম দেখেছিলো ছায়ার মত একটি বলিষ্ঠ পুরুষকে। তার মন ভরে উঠেছিলো আশায়, আনন্দে, হাত বাড়িয়ে তার হাতখানা ধরেছিলো, বুকে মাথা রেখে শান্তি লাভ করেছিলো। কিন্তু যে মুহূর্তে সে তার কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলো--- বাবা, এ এমন করছে কেন গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে সরে গিয়েছিলো ফুল। তারপর আর কোনোদিন ওর বুকে মাথা রাখেনি সে। দৃষ্টিশক্তি সচ্ছ হলে সে দেখেছিলো—যাকে সে পরিচিত আপনজন বলে মনে করেছে—এ সে নয়। কান্নায় ভেংগে পড়েছিলো ফুল সেদিন।

❑

তারপর কেটে গেছে বেশ কিছু মাস, ফুল নতুন জীবন লাভ করেছে। সেদিনের সেই বলিষ্ঠ পুরুষটিকে স্পষ্ট করে দেখেছে, জেনেছে তাকে— সে তার কামনার-সাধনার সেই লোক নয়। এ হলো তার জীবন-রক্ষক কেশব।

কেশব ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে, ওর কাছে ঋণী সে সর্বতোভাবে। তাই বলে তাকে ভালবাসা যায় না।

ফুল কেশবকে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে, কিন্তু ওকে বিয়ে করতে পারেনা।

ফুল ওকে বিয়ে করতে না চাইলে কি হবে, সন্ন্যাসী বাবাজীও ফুলকে নির্জনে ডেকে বললেন—কেশবকে বিয়ে করো। ওকে বিয়ে না করলে আমার তপস্যা নষ্ট হয়ে যাবে।

চমকে উঠলো ফুল—বাবা!

হাঁ মা, আমার জীবনের জীবন হলো ঐ কেশব। ওকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সেজেছি, শুধু ঐ কেশবকে জীবিত রাখার জন্যে.....

বাবাজী, আমি যে বিবাহিতা!

শুনেছি, কেশব আমাকে সেকথা বলেছে।

কি করে আমি কেশব ভাইকে স্বামী বলে গ্রহণ করবো, বাবাজী? এক নারীর কি দুই স্বামী থাকতে পারে?

কেন পারে না মা? তোমাদের মুসলমান ধর্মে না থাকলেও আমাদের হিন্দু ধর্মে চলে।

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠে ফুল—কোনোদিন তো এমন দেখিনি!

হাঁ দেখোনি, কিন্তু শুনে থাকবে। আমাদের দ্রৌপদীর পঞ্চপতি ছিলো।

বাবাজী!

মা, আমার কেশবের মুখ চেয়ে ওকে তোর বিয়ে করতেই হবে। তাছাড়া তোর স্বামী বেঁচে আছে না নেই, তাও তো জানিস্‌নে। আর আপত্তি করিস্‌নে মা।

ফুল বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাবাজীর কথার কোনো জবাব দিতে পারেনা, চলে যায় সেখান হতে। কুঠির মধ্যে প্রবেশ করতেই দেখতে পায়—মাটির বিছানায় খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে নিদ্রামগ্ন কেশব। পাশের জানালা দিয়ে বেলা শেষের সূর্যাস্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেছে। সে আলোকে কেশবের মুখখানা বড় করুণ বলে মনে হলো, বড় ম্লান বড় অসহায় সে মুখ।

নির্বাক নয়নে ফুল তাকিয়ে আছে কেশবের ঘুমন্ত মুখের দিকে। মনে পড়ে তার আর একখানা মুখের কথা, না জানি সে মুখ আর জীবনে সে দেখতে পাবে কিনা। ফুলের চোখের সামনে মিশে যায় কেশবের মুখ, তার মানসপটে আঁকা মুখখানা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠে। কেশব অদৃশ্য হয়, জেগে উঠে তার হারানো জন।

ফুল নিজের অজ্ঞাতে গিয়ে বসে কেশবের শিয়রে, হাত রাখে ওর মাথার চুলে। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে চলে সে।

হঠাৎ নিদ্রা টুটে যায় কেশবের, চোখ মেলে তাকায়।

সঙ্গে সঙ্গে পালাতে যাচ্ছিলো ফুল।

কেশব পথ রোধ করে দাঁড়ায়—থামো।

না না, আমাকে যেতে দাও কেশব ভাই! আমাকে যেতে দাও।

তবে কেন এসেছিলে বলো? ফুল, জানি তুমি আমাকে ভালবাসো, কিন্তু কেন তোমার এতো দ্বিধা?

না—না, আমি তোমাকে ভালবাসিনে। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

ফুল!

পথ ছাড়ো কেশব ভাই?

না, আমি তোমার পথ ছাড়বো না।

কেন?

ফুল, নারী কি বস্তু আমি জানতাম না। নারী সম্বন্ধে আমার কোনো উত্তেজনা ছিলো না। কিন্তু তুমি—তুমিই আমার চোখে নারীর রূপ তুলে ধরেছো। আমার হৃদয়ে তুমিই জাগিয়েছো পৌরুষত্ব-ভাব। আমার ধমনীতে তুমিই....

থামো—থামো কেশব ভাই, দয়া করে থামো।

ফুল!

গভীর বেদনা ভরা দৃষ্টি নিয়ে এগুতে থাকে কেশব ফুলের দিকে—ফুল, আমার হৃদয় তুমি শুস্ক মরুভূমি করে দিও না। যদি তাই করতে চাও, তবে কেন এসেছিলে আমার পাশে। কেন আমার মাথায় তুমি হাত রেখেছিলে? বলো—বলো ফুল?

আজকের মত আমাকে মুক্তি দাও।

মুক্তি! ফুল, তুমি আমার কাছ থেকে কোনোদিন মুক্তি পারে না। আমার সাধনা তুমি। কেশব ওর হাতখানা ধরে ফেলে চট্ করে। আবেগ ভরা কণ্ঠে ডাকে—ফুল!

কেশবের বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় ঘেমে উঠে ফুলের নরম কোমল হাতখানা। নিজেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলে। কিন্তু কেশবের হাতের মুঠা থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে পারে না ফুল।

এমন সময় বাবাজীর কণ্ঠ শোনা যায়—কেশব! কেশব!

কেশব ফুলকে মুক্ত করে দিয়ে বেরিয়ে আসে কুঠির হতে, বলে—বাবা, তুমি ডাকছো?

হাঁ। শোন কেশব, রাজবংশের ছেলে হলেও তুমি আজ আমারই সন্তান। সন্ন্যাসী-পুত্র হয়ে কোনো অসংযত কাজ করা অন্যায়। ফুলকে তুমি ভালবাসতে পারো কিন্তু স্পর্শ করতে পারো না।

বাবাজী, আমাকে ক্ষমা করুন।

যাও, আজ হতে সাবধান থাকবে, বুঝলে?

কেশব নত-মস্তকে বেরিয়ে গেলো সেখান হতে।

❑

অদ্ভুত জীবটা যে পথে চলে গেলো বনহুর ঠিক্ সে পথেই অগ্রসর হলো। সে জানে, ঐ ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক জীবটা যে রাস্তায় চলে যাবে সে পথে সহজে কোনো হিংস্র জন্তু আসবে না।

বনহুর বেশ কিছুটা অগ্রসর হলো। এদিকে ক্রমান্বয়ে ডিজেল-ইঞ্জিনের মত শব্দটা মিলিয়ে যেতে লাগলো। বনহুর তবু চলেছে। হঠাৎ একটা গাছের ডালে দৃষ্টি চলে গেলো তার। মস্ত বড় একটা শালগাছ। উঁচু একটা ডালে সাদা ওড়নার মত কিছু ঝুলছে বলে মনে হলো। বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য

করতেই বেশ বুঝতে পারলো—উঁচু ডালের একটি ফাঁকে মিস শ্যালনকে রাখা হয়েছে। আশে-পাশে কোথাও গরিলা মহারাজ আছে কিনা দেখে নিয়ে বনহুর গাছটার গুড়ির নিকটে এসে দাঁড়ালো।

বিরাট উঁচু গাছ। গাছের গুড়িটা প্রায় চল্লিশ হাত প্রশস্ত হবে। নিচের দিকে কোনো ডালপালা না থাকায় বনহুর খুব চিন্তায় পড়লো। গাছে উঠা তার সমস্যা হবে না, কিন্তু শ্যালনকে নিয়ে নামাটা মুস্কিল হবে। সুচতুর গরিলা তার খেলনা মেয়েটিকে এবার গুহায় না নিয়ে গিয়ে রেখেছে গাছের ডালের ফাঁকে, যেখান থেকে সে নিজেও নামতে পারবে না বা কেউ তাকে চুরি করেও নিয়ে যেতে পারবে না।

বনহুর শাল-বৃক্ষের অদুরে আর একটা মাঝারি বৃক্ষ বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেলো, এবং কৌশলে সে চলে এলো পাশের বিরাট বৃক্ষটায়।

বনহুর সতর্ক কণ্ঠে ডাকলো—শ্যালন, শ্যালন.....

কোনো সাড়া নেই। আবার ডাকলো বনহুর—শ্যালন.....

এবার করুণ ভয়ার্ত একটি কণ্ঠস্বর—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও...

শ্যালন...শ্যালন....

আলম! আলম.....

আমি এসেছি, শ্যালন ভয় নেই—আমি এসেছি। বনহুর অতি কৌশলে শাখা বেয়ে এগুতে লাগলো শ্যালনের দিকে। অনেক চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যে বনহুর পৌঁছে গেলো শ্যালনের পাশে। সুউচ্চ শাখার দুটি ডালের ফাঁকে একটু চওড়া জায়গায় শ্যালনকে রেখেছে গরিলা। জানে, এখানে কেউ তার পুতুল মেয়ের সন্ধান পাবেনা। তাই বুঝি নিশ্চিন্ত মনে দূরে কোথাও ঘুরতে গেছে।

বনহুর নিকটে পৌঁছতেই শ্যালন তাকে জড়িয়ে ধরলো—আমাকে বাঁচাও আলম। আমাকে বাঁচাও....

ভয় নেই শ্যালন। তুমি সাহস নিয়ে আমার সঙ্গে নামতে চেষ্টা করো।

কিন্তু আমি তো গাছে উঠতে জানিনে, নামতেও জানিনে, কি করে নামবো? আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবোনা।

তাহলে তোমাকে নিয়ে নামবো কি করে? তুমি বরং আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো, আমি এ গাছ থেকে ও গাছে যাবো। ঐ গাছটা তবু খাটো আছে, এবং ডালপালা বেশ উঁচু নীচু আছে। নামতে তেমন কষ্ট হবেনা।

শ্যালন তার হাত দু'খানা দিয়ে বনহুরের কাঁধটা বেশ করে ধরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো। ওকে বাম হস্তে ধরে রাখলো এঁটে।

বনহুরের প্রচেষ্টায় অল্পক্ষণেই শ্যালন নেমে এলো নীচে। আনন্দ আর ধরেনা শ্যালনের, বনহুরের গণ্ড সে চুমোয় চুমোয় ভরে দিলো।

বনহুর হেসে বললো—আগে চলো তাবুতে। এখানে বিলম্ব করা আমাদের এক মুহূর্ত উচিৎ নয়। কারণ তোমার সেই প্রিয় নায়ক মহাশয় এসে যেতে পারেন।

সত্যি, তুমি না হলে ওর হাত থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম হতোনা। আবার শ্যালন বনহুরের কণ্ঠ তার সরু দুটি বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

বনহুর এবার তার জবাব দেয়, শ্যালনের কোমল নরম গণ্ডে কঠিন দুটি ওষ্ঠের ছাপ পড়ে। কিন্তু বনহুর আর দেরী করেনা, শ্যালনের হাত ধরে দ্রুত অগ্রসর হয় সে তাবুর দিকে।

❑

তাবুতে ফিরে আসতেই প্রফেসার ম্যাকমারা কন্যাকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর অনেক রোদন করলেন। বনহুরকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবেন, ভাষা খুঁজে পেলেন না।

বনহুর বললো—ধন্যবাদ জানাবার সময় এখন নেই, এখানে বিলম্ব হলে আবার সে আক্রমণ করতে পারে, কাজেই তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। বনহুর নিজেও তাবু গুটাতে ওদের সাহায্য করলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা রওয়ানা দিলো।

❑

প্রফেসার ম্যাকমারা তার দলবল নিয়ে ফিরে চলেছেন, কিন্তু মনে তাঁর পূর্ণ আনন্দ নেই। আসার সময় তারা এসেছিলেন যতগুলো কিন্তু ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের মধ্যে কয়েক জনকে বিসর্জন দিয়ে। বড় বেদনা, বড় দুঃখ এটাই প্রফেসারের—সবাই মিলে ফিরে যেতে পারলেন না।

পথে তেমন কোনো বিপদের সম্মুখীন আর হলোনা তারা। তবু একটা আশঙ্কা ছিলো—না জানি কোন্ মুহূর্তে আবার সেই গরিলা মহারাজ হামলা চালিয়ে বসে। কিন্তু গরিলা মহারাজ আর তাদের আক্রমণ করলোনা। হয়তো সে তার ছোট্ট মেয়েটার জন্য বনে, জঙ্গলে হাতড়ে ফিরছে।

জাহাজে উঠে তবে সবাই নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলো।

বনহুরকে তারা এ গহন জঙ্গলে একা ছেড়ে দিলোনা, তাকেও প্রফেসার ম্যাকমারা তাদের জাহাজে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

রাজী না হয়ে কোনো উপায়ও ছিলোনা বনহুরের।

আফ্রিকার জঙ্গল ত্যাগ করে জাহাজ সাগরবক্ষে ভাসলো।

জাহাজে সবার মনেই আনন্দের বান বয়ে যাচ্ছে, আফ্রিকার জঙ্গল হতে প্রাণ নিয়ে ফেরা—এ কম কথা নয়!

মিস শ্যালনের আনন্দ সবচেয়ে বেশি, প্রাণ নিয়ে ফেরার আনন্দের চেয়ে তার আনন্দ অনেক বেশি, কারণ আফ্রিকার জঙ্গলে সে খুঁজে পেয়েছে তার সাথী—তার কামনার জনকে। বনহুর শ্যালনের জীবনে পরম এক সম্পদ।

শ্যালন সব কিছু কষ্ট-ব্যথা ভুলে গেলো, খুশিতে সে আত্মহারা আলম তার সঙ্গে আছে। সে ভাবতেও পারেনি, আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে এমন একটি ব্যক্তিকে সে সাথীরূপে খুঁজে পাবে।

রেলিংএর ধারে পাশা পাশি বনহুর আর শ্যালন দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলো। বনহুর তাকিয়ে ছিলো দূরে সরে যাওয়া কালো রেখার মত দাগটার দিকে। দাগটা আসলে অন্যকিছুই নয়, আফ্রিকার জঙ্গলটা ক্রমে দূরে সরে গিয়ে একটা রেখার মত মনে হচ্ছিলো।

বনহুর তাকিয়ে ছিলো সে দিকে, প্রায় সপ্তাহ কাল তাকে এ জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে তাকে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝা পড়া করে চলতে হয়েছে। আজ সে জঙ্গল ত্যাগ করে সে চলেছে.....আফ্রিকার জঙ্গলের সঙ্গে রয়ে গেলো তার এক গভীর সম্বন্ধ।

শ্যালন বনহুরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—কি এতো ভাবছো, আলম?

বনহুর ফিরে তাকায় শ্যালনের উজ্জ্বল দীপ্তময় সরল মুখখানার দিকে, হেসে বলে—ভাবছি আফ্রিকার জঙ্গলটা কেন ত্যাগ করলাম।

উঃ কি সাংঘাতিক মানুষ তুমি!

কেন?

আফ্রিকার জঙ্গলের মায়া এখনও তুমি ত্যাগ করতে পারোনি! আমি কিন্তু আর কোনোদিন ঐ মৃত্যুভয়াল আফ্রিকার জঙ্গলে যাবোনা।

শ্যালন, মৃত্যুকে তুমি খুব ভয় করো, না?

তোমার বুঝি মৃত্যুকে ভয় নেই?

না শ্যালন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আমার আনন্দ।

তাই তো তুমি ঐ মৃত্যুভয়াল জঙ্গলটাকে এতো ভালবেসে ফেলেছো। কিন্তু জানো, আমি তোমাকে আর কোনোদিন ঐ জঙ্গলে যেতে দেবোনা। আলম, তোমাকে পেয়ে আমি কত যে খুশি হয়েছি কি বলবো!

মনে মনে হাসে বনহুর—কত নারীর মুখে সে এ কথা শুনেছে, কিন্তু শ্যালনের মুখে যত মিষ্টি লাগছে তেমন করে বুঝি আর লাগেনি। বনহুর ভাবে—শ্যালন আর তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। শ্যালন ফুলের মত সুন্দর-পবিত্র, যেন একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শ্যালনের মুখের দিকে।

শ্যালন বলে—কি দেখছো?

শ্যালন!

বলো আলম?

শ্যালন, আমাকে পেয়ে তুমি খুশি হয়েছো সত্য কিন্তু আমি তো তোমাকে খুশি করতে পারবো না কোনোদিন।

তার মানে?

যাক্, পরে তার মানে বলবো।

না, এখনই তোমাকে বলতে হবে।

চলো তোমার ক্যাবিনে যাই।

এবার শ্যালন খুশি হলো, বললো—চলো, সত্যি এতোক্ষণ তোমাকে আমার ক্যাবিনে নিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিলো। বাবাটা যেন কি, কোথায় যে কি কাজ নিয়ে মেতে আছেন কে জানে।

যাক, উনি ব্যস্ত আছেন।

বনহুরকে নিয়ে শ্যালন নিজের ক্যাবিনে আসে।

সেখানে পৌঁছতেই প্রফেসার ম্যাকমারাকে দেখতে পেলো ওরা। ম্যাকমারা বললেন—হ্যালো আলম আমি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। এসো আলম, এসো তোমরা। বসো। ম্যাকমারা হাত দিয়ে পাশের আসন দু'টো দেখিয়ে দিলেন।

বনহুর আর শ্যালন আসন গ্রহণ করলো।

ম্যাকমারা সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট অগ্নি সংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন—আলম, আমরা কোথায় চলেছি এখনও তোমাকে জানানো হয়নি। শ্যালনও শোনেনি।

শ্যালন বলে উঠলো—আমরা হাঙ্গের শহরে আমাদের দেশে ফিরে যাচ্ছি।

না মা, দেশে ফিরে যাচ্ছিনে।

তবে কোথায় যাচ্ছো বাবা?

সে এক নতুন দেশে।

এবার কথা বললো বনহুর—নতুন দেশ!

হাঁ। বাংলাদেশে যাবো এবার।

শ্যালন ও বনহুর এক সঙ্গে উচ্চারণ করলো—বাংলাদেশ!

আমরা বাঙালী হয়েও আজও বাংলাদেশ চোখে দেখিনি। বাংলাদেশের কাহিনী শুনে আমাদের মনে কত কথা জেগেছে, বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্য নাকি মানুষকে অভিভূত করে ফেলে...একটু আনমনা হয়ে যান ম্যাকমারা।

প্রফেসার ম্যাকমারার কথাগুলো বনহুরের মনেও আঁচড় কাটে। সত্যি, সেও তো বাঙালীর ছেলে, অথচ বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় নেই। বনহুর মায়ের মুখে শুনেছে, তাদের পূর্ব-পুরুষের একজন বাংলাদেশ থেকে কান্দাই চলে আসেন কোনো কার্যোপলক্ষে। তারপর তিনি আর ফিরে যান নি। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে কান্দাই শহরের বাইরে একটি ভাল জায়গা দেখে ঘর বাঁধেন। কিন্তু চৌধুরী বংশের অমর্যাদা করেননা। কান্দাই শহরেও তিনি ঘরবাড়ি তৈরি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, বহু জমি জায়গা তিনি সন্তান-সন্ততিদের জন্য ক্রয় করেন, এবং কান্দাই শহরে চৌধুরী পরিবার রূপে পরিচিত হন। বনহুরের পিতা এই চৌধুরী বংশেরই সন্তান।

ম্যাকমারার কথায় বনহুরের ধমনীতে জেগে উঠলো এক নতুন উন্মাদনা। বাংলাদেশের স্বপ্ন সে দেখেছে কিন্তু বাংলার আস্বাদ সে পায়নি। নূরীকে হারিয়ে বনহুর ভেবেছিলো বাংলায় যাবে কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে তা হয়ে ওঠেনি। মনে মনে খুব খুশি হলো বনহুর।

ম্যাকমারা বলতে শুরু করলেন—আফ্রিকার জঙ্গল আমার মনে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার পরিপূর্ণ আশায় আমি বাংলায় যেতে চাই। জানিনে, সেখানে আমি সম্পূর্ণ শান্তি ফিরে পাবো কিনা। আলম, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকো তবে আমি অনেক খুশি হবো।

শ্যালন বলে উঠলো—উনি তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।

বনহুর বললো—কিন্তু আমার একবার কান্দাই যাওয়া দরকার ছিলো।

কান্দাই! চমকে উঠে কথাটা বললেন ম্যাকমারা।

হাঁ, কান্দাই আমার দেশ।

শ্যালন ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুরের নাম তাহলে জানা আছে তোমার?

কান্দাই যখন আমার বাড়ি তখন নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আমার জানাশোনা থাকতে পারে।

বলো কি আলম! বললেন ম্যাকমারা।

হাঁ, দস্যু বনহুর আমার পরিচিত ব্যক্তি।

আশ্চর্য তো! বললেন ম্যাকমারা। আচ্ছা আলম, তুমি তাকে দেখেছো?

বললাম তো সে আমার পরিচিত জন।

সত্যি বলছো?
হাঁ শ্যালন।
এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে ডাকলেন—প্রফেসার, একটু আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।
ম্যাকমারা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।
শ্যালনের চোখের বিস্ময় কাটেনি তখনও, বললো সে—কেমন দেখতে দস্যু বনহুর?
তোমার কেমন মনে হয়?
বলোনা, দস্যু বনহুর কেমন দেখতে?
তাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?
না—না, তাকে দেখতে চাইনে... ...
কেন?
দস্যু বনহুর নাম শুনলেই আমার বুকটা ধক্ ধক্ করে।
তাহলে তার চেহারার বর্ণনা শুধু শুনতে চাও?
হাঁ।
যদি বলি ঠিক আমার মত।
যাও ঠাট্টা করোনা....শ্যালন বনহুরের সোফার হ্যাণ্ডেলে বসে গলা জড়িয়ে ধরে—তোমার মত সুন্দর হবে দস্যু বনহুর, কি যে বলো!
তাহলে ধরো তোমার সেই গরিলা মহাশয়ের মত।
যাও ও কথা বলোনা, গরিলাটার কথা মনে হলে এখনও আমার প্রাণ শুকিয়ে যায়।
আর দস্যু বনহুরের কথা শুনে কেমন হয়?
উঃ কি সাংঘাতিক দস্যু সে; গরিলা তবু ভাল! তার চেয়েও অতি ভয়ঙ্কর ঐ দস্যু বনহুর। দিনে-দুপুরে লোকের বুকে ছোরা বসাতে এতোটুকু কুণ্ঠা বোধ করেনা।
কিন্তু শ্যালন, তুমি জানোনা—সে আমার বন্ধু।
তোমার বন্ধু, আশ্চর্য!
আশ্চর্য হবার কিছু নেই শ্যালন, দস্যু বলে সেকি মানুষ নয়? যাক্ সে তো আর এ জাহাজে আসছে না, তার কথা শুনে কোনো লাভ নেই।
না, তোমাকে আরও বলতে হবে। তুমি যখন দস্যু বনহুরের বন্ধু, তাহলে তাকে আমি ভয় করিনে, তোমার সঙ্গে থাকলে সে আমাকে নিশ্চয়ই কিছু বলবেনা।
হাঁ, তাকে ভয় পাবার কিছু নেই, সেও মানুষ—তুমিও মানুষ।
আচ্ছা আলম, তোমার দস্যু-বন্ধু নাকি মস্ত বড় শক্তিমান?

তার সম্বন্ধে আর কি শুনেছো?

অনেক কথাই শুনেছি। দস্যু বনহুর শুধু দস্যুতাই করেনা—সে নাকি মেয়েদের চুরি করে নিয়ে যায়, তাদের জোর করে....

মিথ্যে কথা শুনেছো শ্যালন, তোমরা শুনেছো আর আমি তাকে দেখেছি। কোনো মেয়েকে সে কোনোদিন কু'অভিসন্ধি নিয়ে চুরি করেনি। কারণ আমার বন্ধু অসৎচরিত্র নয়।

খুব তো বন্ধুর প্রশংসা করছো?

সত্যি যা তা না বলে তো পারছিনে।

আচ্ছা আলম, সত্যি তোমার বন্ধু ঐ দস্যুটা?

হাঁ।

কেমন দেখতে বলোনা ঠিক করে?

যদি বলো আমি তাকে তোমার পাশে নিয়ে আসতে পারি।

এই জাহাজে?

হ্যাঁ, এই জাহাজে।

এ তুমি কি বলছো আলম?

সত্যি কথা বলছি। জানো দস্যু বনহুর যাদু জানে? তুমি তাকে দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছো, এ কথা সে জানতে পেরেছে।

বলো কি?

সে আরও জানতে পেরেছে—তুমি তাকে নারী হরণকারী বলে দোষ দিয়েছো।

মিছে কথা।

মোটেই নয়। যাক্, চলো বাইরে ডেকের ধারে গিয়ে দাঁড়ানো যাক্।

সে সময় ফিরে এলেন ম্যাকমারা, বললেন—আলম, এসো তোমার ক্যাবিনটা তোমাকে দেখিয়ে দিই।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর—চলুন।

শ্যালনও উঠে পড়লো।

শ্যালনের ক্যাবিনের কায়েকখানার পরই দস্যু বনহুরের ক্যাবিন। এ ক্যাবিনটা অন্যান্য ক্যাবিনের চেয়ে সুন্দর—পরিস্কার ঝক ঝকে।

একদম রেলিং এর ধারেই ক্যাবিনটা, পাশের শার্সী দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় সমুদ্রের ফেনিল জলরাশি।

বনহুর এ শার্সীর পাশে দাঁড়িয়ে সীমাহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে কত কথা। জীবনের সমস্ত ঘটনা এক এক করে ভেসে উঠে চোখের সম্মুখে। তার এই বত্রিশ বছর বয়সের ঘটনা। মা, বাবা, দস্যু কালু খাঁ, রহমান, নূরী, মনিরা, শিশু নূর-সবাই তার মনকে চঞ্চল করে তোলে। ফিরে যাবার

জন্য উতলা হয়ে উঠে। আস্তানার সবাই কেমন আছে, কে কি করছে, সব জানার বাসনা জাগে তার মনে।

কিন্তু সব কথা তলিয়ে আজ বার বার মনে পড়ে নূরীর কথা। নূরীর স্মৃতি তাকে আনমনা করে তোলে। নূরীকে হারিয়ে বনহুর হারিয়েছে তার মনিরাকে। ভয় হয় মনিরার পাশে যেতে, হঠাৎ যদি নূরীর স্মৃতি মনিরার কাছে তাকে দুর্বল করে তোলে। মনিরা তার বাস্তবের রাণী আর নূরী তার কল্পনা। ক্ষণিকের জন্য নূরীকে বনহুর পেয়েছিলো, একান্ত আপন করে পেয়েছিলো, কিন্তু সে পাওয়া শুধু বেদনাই দিয়ে গেলো—আনন্দ নয়।

নূরীকে ভুলতে গিয়ে বনহুর ভুলে গেছে তার জীবনের সব কিছু। নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছিলো—এমন দিনে সে পেয়েছিলো মীরাকে, মীরা তার জীবনে একটা ধ্রুবতারার মত জ্বলে উঠেছিলো, কিন্তু মীরা তার মানসপটে আসন গাড়তে পারেনি। বনহুরের বুকে যখন একটা তীব্র বেদনা খাঁ খাঁ করে ফিরছে, তখন সে পেলো শ্যালনকে। শ্যালনের সচ্ছ সুন্দর স্বভাব তার মনকে আকৃষ্ট করলো। শ্যালনের মধ্যে বনহুর খুঁজে ফিরতে লাগলো তার নূরীকে।

হঠাৎ ক্যাবিনে প্রবেশ করলো শ্যালন, বনহুরকে অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করতে দেখে পা টিপে টিপে অগ্রসর হলো। পিছন থেকে বনহুরের চোখ দু'টো টিপে ধরলো সে।

বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেলো, তার বলিষ্ঠ হাত দু'খানা দিয়ে শ্যালনের হাত দু'খানা ধরে ফেললো, শান্ত মিষ্ট কণ্ঠে বললো-শ্যালন!

খিল খিল করে হেসে উঠলো শ্যালন—আলম, কি ভাবছিলে?

বনহুর শ্যালনকে মুক্তি না দিয়ে গভীর ভাবে আকর্ষণ করলো। হেসে বললো—তোমার কথা। মুখটা ওর নূয়ে এলো শ্যালনের সুন্দর সরু দুটি ঠোঁটের উপর।

শ্যালন বনহুরকে বাধা দিলোনা।

পরবর্তী বই

বাংলাদেশে দস্যু বনহুর

বাংলাদেশে দস্যু বনহুর-২৪

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললো মিস শ্যালন— বড় দুষ্ট তুমি!

বনহুর কোনো কথা বললো না, মুখভাব তার গম্ভীর হয়ে উঠেছে। মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা তীব্র অনুভূতি তার সমস্ত দেহ-মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, নিজেকে বড় উত্তেজিত মনে করলো বনহুর। অধর দংশন করে বললো— যাও, যাও শ্যালন, এখানে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না---- যাও তুমি----

শ্যালনের মুখভাব রাঙা হয়ে উঠেছে, হঠাৎ বহুরের গম্ভীর হয়ে যাওয়ার কারণ সে ভেবে পেলো না। ধীর পদক্ষেপে সে ক্যাবিন ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর পায়চারী করতে লাগলো, বার বার আংগুল দিয়ে মাথার চুলগুলো টেনে ছিড়তে লাগলো, অধর দংশন করে আপন মনে বলে উঠলো-------না না তা হয়না, সে দস্যু হতে পারে কিন্তু সে লম্পট নয়। কোন অসহায় নারীর জীবনকে সে বিনষ্ট করতে পারে না। শ্যালন অবলা-অসহায় বুদ্ধিহীন, তাই বলে তার সর্বনাশ সে করতে পারেনা।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে ম্যাকমারা, হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে ডাকে— আলম!

বলুন স্যার?

আমরা এখন বাংলাদেশ অভিমুখে চলেছি। প্রথমে কোথায় আমরা অবতরণ করবো এখনও ঠিক করিনি। তোমার কাছে এলাম কথাটা জিজ্ঞেস করতে।

বনহুর ম্যাকমারাকে আসন গ্রহণ করতে বলে নিজেও আসন গ্রহণ করলো।

ম্যাকমারা একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন— এখন আমাদের জাহাজ ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে চলেছে। আমরা দু'সপ্তাহ পর বঙ্গোপসাগরে পৌছতে সক্ষম হবো, তারপর আমাদের জাহাজ একসময় পৌছবে ডায়মণ্ড হারবার বন্দরে।

বনহুরের চোখ দুটো খুশিতে চক্ চক্ করে উঠলো, বাংলাদেশের দৃশ্যগুলো তার চোখে কল্পনার রঙ ছড়িয়ে দিলো। বললো বনহুর— প্রথমে কোন্ শহরে অবতরণ করতে চান স্যার?

কলকাতা! প্রথম আমি কলকাতা নগরীতেই কয়েকদিন কাটাবো ভাবছি।

বেশ, তাই ভাল।

আলম!

বলুন স্যার?

আমাদের সঙ্গে তোমার কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে না তো?

ন্যা স্যার, আমি বেশ ভালই আছি, তবে দেশের জন্য মনটা বড় কাঁদছে।

আলম, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো- করবো করেও আমার সময় হয়ে ওঠেনি।

বেশ তো করুন?

আমার একবার শ্যালনকে যখন তোমার হাতে সঁপে দেবো মনস্থ্ করেছি তখন তোমার সম্বন্ধে আমার সব জানা উচিত; আচ্ছা আলম?

বলুন?

তোমার বাড়ি কোথায় তা আজও জানিনা।

কান্দাই শহরের এক অখ্যাত অঞ্চলে।

তার মানে?

মানে, জায়গাটা বড় সুবিধার নয়।

গ্রামাঞ্চলে বুঝি?

হাঁ, গ্রামাঞ্চলই বটে।

তা তোমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন আছেন কি?

বাবা নেই, মা আছেন। আত্মীয়-স্বজন আছেন কিছু কিছু।

অবস্থা কেমন?

মোটামুটি আছে।

তোমার চেহারা দেখলে কিন্তু খুব বড়ঘরের ছেলে বলে মনে হয়।

আমার বাবা কান্দাই-এর বড় একজন নামকরা জমিদার ছিলেন।

সে রকম আমার ধারণা। দেখ আলম, বাংলায় গিয়ে একটা শুভদিন দেখে তোমার আর শ্যালনের বিয়েটা-----------

নিশ্চয়ই--- নিশ্চয়ই-- কিন্তু-------

কিন্তু আবার কি?

আমার মায়ের বিনা অনুমতিতে আমি কিছু করতে পারবো না

তাহলে শ্যালনকে তুমি---

আপাততঃ সম্ভব নয়।

আলম!

ঘাবড়াচ্ছেন কেন, সময় এলে সব হবে স্যার।

ম্যাকমারা আলমের হাত মুঠোয় চেপে ধরলেন— দেখ আলম, তোমাকে ছাড়া আমার শ্যালন কিছু ভাবতে পারেনা। সে শুধু তোমাকেই চায়।

বনহুর কোনো কথা বলতে পারে না।

ম্যাকমারাও নিশ্চুপ।

শুধু জাহাজের একটানা ঝক ঝক শব্দ আর সাগরের জলোচ্ছ্বাসের গর্জন ধ্বনি ক্যাবিনটাকে মুখর করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললেন ম্যাকমারা— শ্যালনের খুশির জন্য আমার সব বিলিয়ে দিতে পারি। আলম, বলো তুমি কি চাও?

হাসলো বনহুর।

ম্যাকমারা বললেন—জানি তুমি বলবে না। কিন্তু মনে রেখো আলম, আমার অবর্তমানে আমার কন্যা শ্যালন সব ঐশ্বর্যের অধিকারিনী হবে। তোমার কোনো কিছুর অভাব হবে না কোনোদিন।

বনহুর এবার সোজা হয়ে বসলো, বললো সে— স্যার, আমি সব শুনেছি শ্যালনের মুখে, কিন্তু আমারও একটা কথা আছে যা বললে আপনি আপনার সংকল্প ত্যাগ করবেন।

কি এমন কথা বলো আলম?

অনেক দিন থেকে আমিও কথাটা বলবো-বলবো ভাবছি কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। স্যার, শ্যালনকে বিয়ে করা আমার সম্ভব নয়।

চমকে ওঠেন ম্যাকমারা— কেন!

ইতিপূর্বে আমার বিয়ে হয়েছে— আমি বিবাহিত।

হেসে উঠলেন ম্যাকমারা— তাতে কি আসে যায়! আমাদের মধ্যে যত খুশি বিয়ে করা চলে, কোনো বাধা নেই।

আশ্চর্য হয়ে শুনলো বনহুর।

ম্যাকমারা বলে চলেছেন— আমি দুটি মহিলাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলাম। সর্বশেষ স্ত্রীর গর্ভে শ্যালন জন্মেছে।

বনহুর ঢোক গিলে বলে—ধন্যবাদ।

ম্যাকমারা বললেন এবার— শ্যালনকে তুমি বিয়ে করতে রাজী হলে তাতে আমার বা শ্যালনের কোনো অমত থাকবে না।

বনহুর ভেবেছিলো, শেষ পর্যন্ত বিয়ের কথা বলে ম্যাকমারা এবং শ্যালনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ হবে ভেবেছিলো, তা হলোনা। বনহুর বেশ চিন্তাগ্রস্থ হলো।

ম্যাকমারা তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করলেন।

বনহুর তার শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। মনের আকাশে ভেসে উঠলো পাশাপাশি দুটি মুখ—মনিরা আর নূরী---

মনিরার সঙ্গে দেখা করা তার একান্ত প্রয়োজন ছিলো। মা হয়তো তার অন্তর্ধানে পাগলিনী হয়ে পড়েছেন। না জানি নূর কেমন আছে। কান্দাই থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এখন সে রয়েছে। ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই, ম্যাকমারার দলের সঙ্গে তাকে যেতেই হবে। বাংলাদেশের নামই সে শুনেছে কিন্তু এবার সে চোখে দেখবে, উপভোগ করবে বাংলাদেশের মাটির আস্বাদ।

❑

সারাদিন বনে বনে কাঠ সগ্রহ করে সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরে আসে কেশব; ফুলের জন্য নানা জাতীয় সুস্বাধু ফল সংগ্রহ করে আনে সে।

সন্ন্যাসী বাবাজী তখন হয়তো আশ্রমের অদূরে কোনো বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। কেশব কাঠের বোঝাটা মাথা থেকে নামিয়ে রেখে উঁকি দেয় কুঠিরের মধ্যে, নাম ধরে ডাকে সে— ফুল, ফুল------- যোগিনীর মত ধীর-মন্থর গতিতে কেশবের পাশে এসে দাঁড়ায় ফুল, বলে— কেশব ভাই, আমাকে ডাকছো?

হাঁ ফুল, এই দেখ তোমার জন্য আজ নতুন এক রকম ফল এনেছি। কেশব কোঁচড় থেকে ফল বের করে মেলে ধরে ফুলের সম্মুখে— নাও।

ফুল যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি থাকে, কোন কথা বলে না।

কেশব বলে আবার—ফুল, তোমার জন্য অনেক কষ্ট করে এ ফলগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। ভারী সুন্দর আর সুমিষ্ট ফল।

ফুল বলে—কেন তুমি আমার জন্য এতো কষ্ট করতে যাও কেশব ভাই?

ফুল, তোমার জন্য আমি সব কষ্ট হাসি মুখে গ্রহণ করতে পারি। তবু তুমি যদি আমার প্রতি সদয় হও।

কেশব ভাই?

ফুল, তুমি যা বলবে আমি জানি, কিন্তু ফল, তুমি ছাড়া আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তাই বুঝি তুমি আমার----------

হাঁ ফুল, তোমার অনুগ্রহ আমার কামনার বস্তু। ফুল, আমার প্রতি তুমি সদয় হও ।

কেশব ভাই!

নাও, এ ফলগুলো তুমি নাও ফুল।

ফুল হাত দুটি পাতে— দাও।

শুধু আজ নয়— প্রতিদিন কেশব ফুলের জন্য বন থেকে ফল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কেশবের স্বপ্ন-সাধনা সব কিছু ফুল। ফুলকে সে জীবনে ভালবেসেছে, ফুলের মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে নতুন এক আস্বাদ, কিন্তু ফুলকে সে কোনোদিন পাবে কিনা তা সে জানেনা।

❑

সেদিন ছিলো পূর্ণিমা, জ্যোছনা ভরা রাত।

ফুল একা বসেছিলো ঝরণার পাশে একটি পাথরখণ্ডে। জ্যোছনার আলো ঝরণার পানিতে এক অপূর্ব ছন্দের সৃষ্টি করে চলেছে। ফুরফুর হাওয়ায় অজানা ফুলের সুরভি বয়ে চলেছে। ফুল আপন মনে একটা গান গাইছিলো।

ফুলের কণ্ঠের করুণ একটা সুর সমস্ত বনভূমির স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ছিলো।

ফুলের কণ্ঠে সুর শুনে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম যেন তন্ময় হয়ে পড়েছিলো, বনের পশুপাখিও যেন হারিয়ে ফেলেছিলো তাদের আপন সত্ত্বা, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো সবাই।

সন্ন্যাসী বাবাজীর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেলো সে গানের সুরে। তিনি তার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন, মোহগ্রস্তের মত অগ্রসর হলেন।

গান শেষ হয়ে গেলো।

সন্ন্যাসী বাবাজী ফুলের কাঁধে হাত রেখে ডাকলেন—মা!

ফুল হঠাৎ সন্ন্যাসী বাবাজীর মধুর আহ্বানে তার বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলো।

সন্ন্যাসী বাবাজীর চোখ দুটো আদ্র হয়ে উঠলো, তিনি সস্নেহে ফুলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। এক সময় বলে উঠলেন সন্ন্যাসী বাবাজী—ফুল, আমি জানি তোমার বুকে অনেক ব্যথা লুকিয়ে আছে। মা, আমি তোমায় যোগ সাধনা শেখাবো; যে সাধনা তোমাকে ভুলিয়ে দেবে তোমার সব ব্যথা বেদনা—সব কিছু। বাস্তব জগৎ হতে তুমি সরে আসবে অনেক দূরে।

তাই করো বাবাজী, তাই আমাকে শিখিয়ে দাও। আমি যেন আমার সমস্ত কথা, সমস্ত স্মৃতি ভুলে যাই, ভুলে যাই আমার অস্তিত্ব।

তাই হবে মা, তাই হবে। কিন্তু কেশবকে তুমি এতোটুকু করুণা করবে না মা?

আমার কোনো উপায় নেই বাবা।

মা, আমি তোমার মনের উপর কোনো জোর করবোনা। তা ছাড়া কেশব আমার হাতে গড়া ছেলে, সে নিশ্চয়ই তোমার অমতে তোমাকে কোনো রকম বিরক্ত করবে না।

হাঁ, কেশব ভাই আমাকে কোনোদিন অন্যায়ভাবে কিছু বলেনি।

মা, চলো— ঘরে চলো।

চলো বাবাজী।

ফুল আর সন্ন্যাসী বাবাজী আশ্রমে ফিরে এলো।

সেদিন হতে ফুল সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকটে যোগ সাধনা শিখতে লাগলো।

সন্ন্যাসীর সম্মুখ আসনে বসে যোগ সাধনা করতো ফুল। তার দেহে শুভ্রবসন, চুলগুলো মাথার উপর ঝুটি করে বাঁধা, ললাটে চন্দনের আল্‌পনা।

আসনে মুদিত নয়নে বসে থাকতো ফুল। সন্ন্যাসী বাবাজী অদূরে আর একটি আসনে উপবিষ্ট থাকতেন।

ফুল বললো— বাবাজী, কি বলবো? কি বলে সাধনা করতে হয় আমি তো জানিনে?

মা, তুমি হিন্দু নারী নও, তুমি মুসলমান; আমাদের আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তা একজন, জাতি যদিও দু'রকম। তোমাদের দেহ-মন সব আছে- তেমনি আছে আমাদের। তোমাদের দেহ ও প্রাণ আছে— আমাদেরও তেমনি। তোমাদের দেহে যেমন রক্ত-মাংসের সমাবেশ— তেমনি আমাদেরও। আমরা ডাকি ভগবান আর তোমরা ডাকো খোদা। কিন্তু নামের উচ্চারণে ভিন্নরূপ শোনা গেলেও আসলে ভগবান বা খোদা সেই একজন— যিনি সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। মা, আমাদের সাধনা আর তোমাদের সাধনার রূপ ভিন্ন আকার হলেও— সাধনা— সাধনাই। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে তুমি যেভাবে ডাকবে তাতেই তিনি সাড়া দেবেন মা, প্রকাশ্যে তিনি কোনো দিন সাড়া দেন না, তিনি সাড়া দেন কাজের মাধ্যমে। তোমার যা মনে চায় সে ভাবে তুমি ডাকবে তোমার সেই অন্তর্যামী মহান সৃষ্টিকর্তাকে। দেখবে, ভুলে যাবে তোমার সব ব্যথা বেদনা— সমস্ত কিছু!

তাই হবে বাবাজী----- তাই হবে।

সেদিনের পর থেকে ফুল সন্ন্যাসী বাবাজীর সঙ্গে বসে যোগ সাধনা করে চললো।

সন্ন্যাসী বাবাজী হিন্দু ব্রাহ্মণ আর ফুল-মুসলমান কন্যা। সন্ন্যাসী বাবাজী ডাকেন তর ভগবানকে, আর ফুল ডাকে তার খোদাকে। যদিও উচ্চারণ দু'জনার দু'রকম কিন্তু আসলে একজনকেই তারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ডেকে চলেছে।

সন্ন্যাসী বাবাজী আর কেশব ভজন গান করতো। ফুল অবাক হয়ে শুনতো। তন্ময় হয়ে যেতো সন্ন্যাসী বাবাজী আর কেশবের ভজনের সুরে।

ফুল অবসর সময় কাটাতো বনের হরিণ-শিশু আর হরিণ-হরিণীদের নিয়ে। ফুলকে দেখলে ওরা পালিয়ে যেতো না, বরং ওকে দেখলে ওরা এগিয়ে আসতো, ঘিরে দাঁড়াতো ফুলের চারপাশে। হরিণ-শিশুকে কোলে করে ফুল বসে আদর করতো, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতো।

তখন হরিণ-হরিণী ফুলের হাত চাটতো বা চিবুক মুখে চেটে সোহাগ জানাতো।

অদূরে দাঁড়িয়ে কেশব উপভোগ করতো এ দৃশ্য। এক সময় এসে বসতো ফুলের পাশে, আবেগ ভরা কণ্ঠে ডাকতো— ফুল!

হরিণ শিশুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আনমনে জবাব দিতো ফুল—বলো?

ফুল, আমার জীবনটা কি তুমি ব্যর্থতায় ভরে দেবে?

ফুল তাকায় কেশবের মুখে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে— কেশব ভাই, যা হবার নয় কেন তুমি তা নিয়ে এতো ভাবো। আমার জীবন রক্ষাকারী তুমি, তোমাকে আমি তিরস্কার করতে পারবো না।

ফুল।

বলো?

তোমার অমতে আমি তোমাকে স্পর্শ করবো না ফুল। কিন্তু তুমি মনে রেখো, আমার জীবনে তুমিই প্রথম আমার স্বপ্ন। নারী সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম ফুল, তুমিই আমার চেতনা এনে দিয়েছো। তোমাকেই আমি ভালবেসে ফেলেছি ফুল----------

ফুলের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠে শুধু কিন্তু কোনো কথা বলতে পারেনা।

কেশব এগিয়ে আসে আরও, ফুলের চোখে অশ্রু দেখে সে বিচলিত হয়ে উঠে, বেদনাকাতর কণ্ঠে বলে— তুমি কাঁদছো?

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখের পানি মুছে ফেলে বলে— না না কাঁদিনি, কাঁদিনি কেশব ভাই---------

ফুল, কেঁদোনা, তুমি যাতে বেদনা পাও তা আমি চাইনে। তোমাকে সুখী করাই আমার ইচ্ছা। ফুল, তুমি যদি আমাকে ভালবাসতে না পারো

তা হলে আমি কোনো দিন জোর করে তোমার কাছে ভালোবাসা দাবী করবো না।

কেশব উঠে দাঁড়ালো, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ধীর-মন্থর গতিতে সেখান থেকে চলে গেলো।

ফুলের মুখ বিষণ্ন-মলিন হয়ে উঠেছে, একটা গভীর বেদনার ছাপ ফুটে উঠে তার চোখে। উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকে ফুল কেশবের চলে যাওয়া পথের দিকে। আজ থেকে কয়েক মাস পূর্বে সে দেখেছে কেশবকে সর্ব প্রথম, তার পাশে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বসেছিলো সে! ফুল চোখ মেলে চাইতেই আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠেছিলো, খুশির উচ্ছাসে তার মুখটা তুলে ধরে ডেকে উঠেছিলো— ফুল!

অপূর্ব একটা অনুভূতি জেগেছিলো কেশবের মনে, ফুলের মতই সুন্দর লেগেছিলো ওকে, তাই সে ফুল বলে ডেকেছিলো প্রথম ওকে।

ফুল চোখ মেলে তাকিয়েছিলো, প্রথম সে দেখেছিলো কেশবকে— সুন্দর দেবকুমারের মতই একটি যুবক। মাথায় কোঁকড়ানো এক রাশ চুল। গলায় জড়ানো যজ্ঞ উপবীত। পরনে গেরুয়া বসন। টানা টানা ডাগর দু'টি চোখে মায়াময় চাহনী। ফুল স্মরণ করে কে এই যুবক, কোথায় তাকে দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না; যুবকটিকে সে স্মরণ করতে পারে না।

একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এসেছিলো তার। ফুল ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলো অপূর্ব জ্যোতির্ময় এক বৃদ্ধকে।

বৃদ্ধ গম্ভীর গলায় বলেছিলেন— আর ভয় নেই কেশব, এ যাত্রা ও বেঁচে গেলো।

ফুল উঠে বসতে গিয়েছিলো তখন।

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বলেছিলো—উঠো না মা, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।

ফুল নিষ্পলক নয়নে দেখেছিলো বৃদ্ধের মুখে মায়া-মমতার গভীর এক সমাবেশ।

তারপর কেটে গেছে কতদিন, ফুল বৃদ্ধের সান্নিধ্য এড়াতে পারেনি। এক মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে সে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আর কেশবের দয়ায় সে পুনর্জীবন লাভ করেছে, তাই সে আজও তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কেশব ভালবাসে তাকে। ফুল জানে, কেশবের ভালবাসা কত গভীর, কত নিবিড়। কিন্তু ফুল পারে না তা গ্রহণ করতে। কেশব নিষ্পাপ, নির্মল, পবিত্র এক যুবক। ফুল জানে, কোনো নারীকে সে আজও স্পর্শ করেনি, তার চরিত্রে নেই কোনো কলুষিত ছাপ। তবু ফুল পারে না তাকে গ্রহণ করতে-----

হঠাৎ ফুলের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, সন্ন্যাসী বাবাজী এসে দাঁড়ান তার সম্মুখে—মা!

চমকে ফিরে তাকায় ফুল, বলে— বাবা, বলো?

ফুল, কেশবের কি হয়েছে?

কেন?

কেশব কুঠিরের মধ্যে অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। মা, ওকে ব্যথা দিস্‌নে মা। আমি তোর কাছে করজোরে বলছি— ও বড় অভিমানী, বড় অসহায়! জীবনে ও কারো কাছে এতোটুকু স্নেহ-মায়া মমতা পায়নি। যা একটু পেয়েছে তা আমার কাছে। কিন্তু আমি তো ওর তপ্ত হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করতে পারিনে। তুই নারী, তোর বুকে লুকিয়ে আছে মায়ের প্রাণ, বধূর দরদ, ভগ্নির স্নেহ----- মা, মা, কেশবকে তুই ভালবাসতে না পারিস্ একটু স্নেহ, একটু মায়া-মমতা দিয়ে ওকে সজীব করে তোল্------

বাবা, আমি তাই করবো, তাই করবো।

যাও মা, কেশব কুঠিরে একা শুয়ে আছে, যাও।

কুঠির মধ্যে প্রবেশ করে থম্‌কে দাঁড়ায় ফুল।

কেশব বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে উবু হয়ে, হয়তো নীরবে রোদন করছে সে।

ফুলের হৃদয়ে একটা ব্যথা টন টন করে উঠলো, বড় মায়া হলো ওর মনে। সত্যি, কেশব কোনোদিন কারো কাছে এতোটুকু ভালবাসা পায়নি, পায়নি কারো স্নেহ-আদর। ফুল ওর বিছানার পাশে গিয়ে বসলো, হাতখানা রাখলো কেশবের পিঠে।

কেশব চমকে তাকালো— কে!

আমি! ফুলের গলাটা কেঁপে উঠলো নিজের অজ্ঞাতে।

কেশব শয্যায় উঠে বসলো— ফুল, কেন তুমি এলে? কেন তুমি আমার মনে জ্বালা ধরিয়ে দাও!

না না, আমি— আমি তোমাকে--- উঠে দাঁড়ায় ফুল।

ফুল, আমার কাছ থেকে তুমি পালাতে পারবে না। যেতে দেবো না তোমায় ফুল। কেশব ফুলের হাত ধরে ফেলে।

ফুল আঁতকে উঠে— ছেড়ে দাও কেশব ভাই।

তা হয়না ফুল।

তুমি না বলেছিলে, আমার কাছে শপথ করেছিলে— তুমি আমাকে কোনদিন স্পর্শ করবেনা?

ফুল। ---- সঙ্কুচিত ভাবে ছেড়ে দেয় কেশব ফুলের হাতখানা। বলে—ফুল, আমাকে তুমি মাফ করে দাও। আমাকে তুমি মাফ করে দাও--

কেশব ভাই!

ফুল। ফুল--- বোন আমার!

এমন সময় সন্ন্যাসী বাবাজী এসে দাঁড়ান কুঠিরের দরজায়, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলেন—সাধু— সাধু— ধন্য কেশব, ধন্য তুমি! কেশব তোমার সংযমশক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আজ থেকে তোমরা দুইজন ভাই-বোন হলে।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো ফুল—বাবাজী!

কেশব তখন খুশিভরা চোখে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখে।

সন্ন্যাসী বাবাজী যেমন এসেছিলেন তেমনি বেরিয়ে গেলেন কুঠিরের মধ্য হতে।

কেশব ফুলের হাত ধরে বললো— ফুল, বোন চলো।

চলো কেশব ভাই।

এখন থেকে ফুলের আর কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই। নেই কোন দ্বন্দ। কেশব আর ফুল ঠিক ভাই আর বোনের মত। এক সঙ্গে ওরা বনে ফুল চয়ন করে মালা গাঁথে। কখনও বা কেশব ফল পেড়ে এনে ফুলকে দেয়, ফুল প্রাণভরে ভক্ষণ করে। কোনো কোনো সময় কেশব ভজন গান করে, ফুল শোনে। ফুল গান গায়—কেশব তন্ময় হয়ে যায় ফুলের গানের সুরে।

এমনি করে দিনগুলো গড়িয়ে চলে ফুল আর কেশবের।

❑

কারো কোমল হস্তের স্পর্শে বনহুরের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায়। চোখ না মেলেই সে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে বিছানায়। কোনো একটা কোমল হস্ত তার ললাটে এবং চুলে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে।

বনহুর একটা নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়। মনে করে, নিশ্চয়ই কোমল হস্তের অধিকারিণী তার ক্যাবিন ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু সে আশা সফল হয় না বনহুরের। হস্ত-সঞ্চালন বন্ধ হয় না বরং আরও গভীর হয়ে উঠে। তার গায়ের চাদরখানা টেনে দেয় হস্ত-সঞ্চারণকারিণী।

বনহুর খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলে— কে তুমি?

ক্যাবিনের অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝতে পারে বনহুর হস্ত-সঞ্চারণকারিণী অন্য কেহ নয়— ম্যাকমারার কন্যা শ্যালন!

শ্যালন জবাব দেয় না কোনো।

বনহুর তার হাত ধরে ঝাকুনি দেয়— কে তুমি?

তবু নিরুত্তর শ্যালন।

বনহুর ঝুকে টেবিল ল্যাম্পটার সলতে বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্যালন উঠে দাঁড়ায়, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর শয্যায় উঠে বসেছিলো, আবার সে শয্যায় শুয়ে পড়ে শান্ত কণ্ঠে বলে— শ্যালন, এতো রাতে আমার ক্যাবিনে তোমার আগমন অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। আমি চাইনে, তোমার আচরণ অন্যের মনে সন্দেহ আনে। ধরো তোমার আব্বা যদি এতো রাতে তোমাকে আমার ক্যাবিনে দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি খুশি হবেন না।

আলম, বাবা এখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

অন্যান্য কেউ তো দেখে ফেলতে পারে।

আমি জানি, ওরা সবাই ভীতু, এতো রাতে জাহাজে কেউ জেগে নেই।

শুধু ক্যাপ্টেন আর সারেঙ্গগণ ছাড়া, তাই না?

হাঁ আলম, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই এদিকে আসবে না।

কি চাও তুমি আমার কাছে?

শ্যালন মাথা নীচু করে।

একটু হাসির শব্দ হয় বনহুরের মুখ থেকে, বলে এবার বনহুর —শ্যালন, এ জাহাজে তোমাকে সঙ্গীরূপে পেয়ে সত্যি আমি নতুন জীবন লাভ করেছি। তোমাকে না পেলে আমি হয়তো আজ এ জাহাজে টিকে থাকতে পারতামনা। কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে কোনোদিন সন্তুষ্ট করতে পারবোনা শ্যালন।

শ্যালন আলমের মুখে দৃষ্টি তুলে ধরলো।

বনহুর বললো— তুমি যা চাও আমি জানি, কিন্তু তা সম্ভব নয়। শ্যালন, পূর্বেই বলেছি— আমি তোমাকে ভালবাসি সত্য, কিন্তু গ্রহণ করতে পারিনে। বনহুর শ্যালনের হাতখানা শক্ত করে মুঠোয় চেপে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বলে— শ্যালন, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

আলম!

শ্যালন, আমি তো পাথর নই— আমি মানুষ। তোমার কাছে আমার অনুরোধ—তুমি নির্জনে আমার পাশে এসো না।

কেন?

সে প্রশ্নের জবাব তুমি নিজের মনকে করো।

আলম, আমাকে ভাল লাগেনা, এই তো?

ভুল বুঝছো শ্যালন, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমার মধ্যে আমি খুঁজে পাই আমার হারানো প্রিয়াকে, তাই— তাই আমার ভয় হয়— হঠাৎ যদি নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলি---

আলম!

শ্যালন, তুমি এভাবে আর এসোনা আমার পাশে। আমাকে উত্তেজিত করোনা।

বেশ, আমি আর আসবোনা। শ্যালন বনহুরের হাতের মুঠা থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

বনহুর মৃদু হাসে।

❑

পর পর কয়েকদিন আর শ্যালন এলোনা বনহুরের ক্যাবিনে।

বনহুর যখন ম্যাকমারার ক্যাবিনে যায় তখন শ্যালন সরে পড়ে সেখান থেকে। একটা দুর্দমনীয় অভিমান তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বনহুরের সঙ্গে দেখা হলেও সে কথা বলেনা, মুখ ভার করে থাকে।

এসব লক্ষ্য করে হাসে বনহুর। সেও আর গায়ে পড়ে কথা বলতে যায় না শ্যালনের সঙ্গে।

বনহুর এদিন ম্যাকমারার কক্ষে প্রবেশ করে দেখে—শ্যালন একা বসে বই পড়ছে। ম্যাকমারা ক্যাবিনের বাইরে কোথাও কোনো কাজে আটকা পড়ে আছেন।

আকাশ সেদিন মেঘাচ্ছন্ন, সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ্ ঝাপ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মাঝে মাঝে সাগরবক্ষে বাজ পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করে ডাকলো—শ্যালন।

শ্যালন যেমনভাবে বই পড়ছিলো তেমনি পড়তে থাকে, কোনো রকম সাড়া দেয় না।

বনহুর হাসলো, শ্যালনের মুখভাব লক্ষ্য করে বললো— শ্যালন, রাগ করেছো?

তবু কোনো জবাব দিলোনা শ্যালন, যেমন বসে ছিলো, তেমনি রইলো।

বনহুর আরও কয়েক পা সরে এসে একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে বললো—বেশ, চলে যাচ্ছি।

ঠিক সে মুহূর্তে বাজ পড়ার শব্দ জাহাজটাকে কাঁপিয়ে তুললো। জাহাজখানার নিকটে সাগরবক্ষে কোথায় বাজ পড়লো।

শ্যালন বই ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে জাপটে ধরলো বনহুরকে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিলো।

পরক্ষণেই শ্যালন সরে যাচ্ছিলো কিন্তু বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলো না।

বনহুর হেসে বললো— অভিমান ঘুচে গেছে তো?

শ্যালন কোনো কথা বললোনা।

এমন সময় ক্যাবিনের বাইরে পদশব্দ শুনে শ্যালনকে মুক্ত করে দিয়ে বললো—তোমার বাবা আসছেন।

অল্পক্ষণ পর ক্যাবিনে প্রবেশ করলেন ম্যাকমারা। শরীরে তার ওয়াটারপ্রুফ্ ভিজে জূতোটা খুলে রেখে ক্যাবিনে এসে দাঁড়ালেন। বনহুরকে দেখে বললেন— আলম তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে খুঁজে ফিরছি তোমার ক্যাবিনে।

বনহুর একটা সোফায় বসে পড়ে বললো— এই বৃষ্টির মধ্যে আপনি কেন কষ্ট করে আমার ক্যাবিনে গিয়েছিলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেই আমি আসতাম।

শোন আলম, কাল আমাদের জাহাজ ডায়মণ্ড হারবারে পৌঁছবে বলে আশা করছি। জাহাজে আমাদের পুরো তিন সপ্তাহ কেটে গেলো, তবে আকাশের অবস্থা যদি আরও খারাপ হয় তাহলে আমরা বাধ্য হবো আরও কিছু সময় বঙ্গোপসাগরে থাকতে। হাঁ, যে কথা তোমাকে বলবো বলে খুঁজছি সেকথা হলো, প্রথমে আমরা কলকাতা শহরে কয়েকদিন কাটাবো। এতে তোমার মত আছে কিনা জানতে চাই? কারণ আমি ওয়্যারলেসে কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনয় সেনকে আমাদের আগমনবার্তা জানিয়ে দেবো। বিনয় সেন আমার বাল্যবন্ধু, এখন সে কলকাতায় আছে।

'পুলিশ কমিশনার' কথাটা বনহুরের কানে যদিও সুমধুর লাগলো না তবু বললো— একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করার কারণ কি স্যার?

এই সাধারণ কথাটা তুমি বুঝতে পারলেনা আলম? তোমার যদি এতে অমত থাকে তবে তুমি যেখানে যেতে চাও তাই হবে।

না না, আমার এতে অমত থাকবে কেন। আমারও সখ এক বার কলকাতা নগরীটা দর্শন করি।

বেশ, তোমার কথা শুনে খুশি হলাম অনেক। কলকাতায় আমার আত্মীয়-স্বজন অনেকে আছেন। বিনয় সেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু। আমরা একই সঙ্গে লণ্ডনে পড়াশোনাও করেছি। পড়াশোনা শেষ করে আমি চলে এলাম নিজের দেশ ছেড়ে জমরুদে; বৈজ্ঞানিক হিসাবে এক ল্যাবরেটরীতে কাজ নিলাম। আর বিনয় যেন পুলিশ বিভাগে বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করে

কমিশনার পদে নিযুক্ত হলো। যদিও আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ বহুদিন যাবৎ নেই, তবু আমাদের বন্ধুত্ব এখনও পূর্বের ন্যায় অটুট আছে। আমরা এখনও উভয়ে উভয়কে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে থাকি। জানো আলম, বিনয় সেন পুলিশ বিভাগে যথেষ্ট নাম করেছে। বহু ডাকাত আর দস্যুকে সে গ্রেপ্তার করে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দস্যু বনহুরের নাম হয়তো শুনেছো, তাকেও গ্রেপ্তারের জন্য বিনয় একবার কান্দাই গমন করেছিলো--

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো— কান্দাই!

হাঁ, বিনয় সেন দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে কান্দাই শহরেও গিয়েছিলো, কিন্তু সফলকাম হয় নি।

কেন তিনি সফলকাম হলেন না স্যার?

শ্যালন এবার বলে উঠলো— দস্যু বনহুরের নাম তো তুমি শোননি আলম— কি সাংঘাতিক দস্যু সে! মিঃ সেন কেন, অমন কত পুলিশ অফিসার তাকে গ্রেপ্তারে হিমসিম খেয়ে গেছে।

হাঁ, শ্যালন যা যা বলছে সব সত্য, খাঁটি সত্য কথা। যদিও কান্দাই আমি কোনোদিন যাইনি, কিন্তু দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমি অনেক কথা অবগত হয়েছি। শুধু কান্দাই শহরেই নয়, সমস্ত আরাকান হতে জমরুদ এবং প্রায় পৃথিবীর বহু স্থানে দস্যু বনহুর তার প্রভাব বিস্তার করেছে। আমি লিবিয়াতে বসে সব অবগত হয়েছি।

দস্যু বনহুর তাহলে ভয়ানক লোক? বললো বনহুর।

শুধু ভয়ানক নয়, সাংঘাতিক দস্যু; হাঁ কি যেন বলছিলাম—বিনয় সেন সেই দুর্দান্ত দস্যুকে গ্রেপ্তার করতে কান্দাই গিয়েছিলো। অবশ্য তখন বিনয় হামবাদ শহরের পুলিশ কমিশনার ছিলো।

বনহুর বললো এবার— আপনার পুলিশ কমিশনার বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত সুখী হবো স্যার।

হাঁ, বিনয় আমাদের দেখলে অনেক আনন্দ পাবে। তাছাড়া আমার সম্পর্কে এক দাদা রয়েছেন। মস্তবড় ব্যবসায়ী— কলকাতায় তার বড় বড় কারবার আছে—নাম আলবার্ড, প্রথমে আমি তার ওখানেই উঠবো। দেখো আলম, তুমি তাকে দেখলে বিশ্বাস করবে না, যদিও সে আমার বয়সে বড় তবু তাকে আমার চেয়ে বয়সে অনেক কম বলে মনে হয়। আলবার্ড বড় ভালবাসেন, স্নেহ করে আমাকে। বহুদিন পর আলবার্ড দাদাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করবো বলে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। পার্ক সার্কাসে তাঁর বাড়ি। আমাদের জাহাজ ডায়মণ্ড হারবার থেকে খিদিরপুর ডকে পৌছলে আমরা মোটর যোগে তাঁর ওখানে যাবো।

❑

ম্যাকমারার কথা অনুযায়ী তাদের জাহাজ ডায়মণ্ড হারবার বন্দরে নঙ্গর করলো। দুই দিন সেখানে অপেক্ষা করবার পর ম্যাকমারার জাহাজ খিদিরপুর ডকের দিকে অগ্রসর হলো।

বৃদ্ধ ম্যাকমারার আনন্দ আর ধরে না। তিনি বালকের মত উচ্ছল হয়ে উঠলেন। বহুদিন পর বাংলা দেশের মাটির আস্বাদ গ্রহণের আশায় তিনি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

শ্যালন হেসে বললো— বাবা, তোমাকে খুব আনন্দমুখর লাগছে, ব্যাপার কি বলো তো?

বনহুরও বসেছিলো তাদের পাশে, বই পড়ছিলো সে শ্যালনের কথায় বলে উঠে বনহুর— মাতৃভূমির ডাক স্যারকে আকর্ষণ করছে, তাই তিনি আনন্দমুখর হয়ে উঠেছেন।

ম্যাকমারা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন— হাঁ আলম, তুমি ঠিকই বলেছো। মাতৃভূমির আকর্ষণ আমকে সত্যিই চঞ্চল করে তুলেছে।

নানা কথাবার্তা আর গল্প-সল্পের মধ্যে সময় অতিবাহিত হয়ে চলে।

খিদিরপুর ডকে পৌঁছে দেখেন ম্যাকমারা, পুলিশ কমিশনার বিনয় সেন স্বয়ং এসেছেন বন্ধুবর ও তার কন্যাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যেতে। বহুদিন পর বন্ধুদ্বয় মিলিত হয়ে আনন্দিত হয়ে উঠলেন। উভয়ে উভয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা। তারপর পরিচয়ের পালা।

ম্যাকমারা তাঁর কন্যা শ্যালনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন— আমার মেয়ে শ্যালন। আর এ হচ্ছে আমার ভাবী জামাতা মিঃ আলম। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গেও বিনয় সেনের পরিচয় করিয়ে দিলেন ম্যাকমারা এবং বিনয় সেনের পরিচয় দিলেন তার দলবলের কাছে।

বিনয় সেনের সঙ্গে বনহুরের হ্যাণ্ডসেক হলো।

বিনয় সেন বললেন— ম্যাকমারা, তোমার ভাবী জামাতাকে দেখে সত্যি আমি আনন্দ বোধ করছি।

বিনয় সেনের কথা শুনে হাসলো বনহুর।

এরপর সবাই রওয়ানা দিলো।

বিনয় সেন নিজের গাড়িতে ম্যাকমারা, শ্যালন আর বনহুরকে উঠিয়ে নিলেন। আর অন্যান্য দুটি গাড়িতে চললো ম্যাকমারার সঙ্গী ছাত্রদল।

প্রথমে খিদিরপুর ডাকবাংলোয় এসে উঠলো তারা।

খবর পেয়ে ম্যাকমারার সম্পর্কীয় দাদা আলবার্ড এসে হাজির হলেন খিদিরপুর ডাকবাংলোয়। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক আলবার্ড। অল্পক্ষণেই তাঁর ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়ে পড়লো।

ডাকবাংলোয় বসে সবাই মিলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো, চা-নাস্তার অবসরে চললো নানা রকম আলাপ-আলোচনা। আফ্রিকার জঙ্গলের কাহিনী শোনাতে লাগলেন ম্যাকমারা।

কয়েকজন মিলে নানারকম আমোদ-আহ্লাদ আর গল্পে-সল্পে অনেক সময় কাটিয়ে দিলেন। যখন রওয়ানা দেবেন ঠিক সে মুহূর্তে এসে হাজির হলেন ম্যাকমারার এক আত্মীয় মিঃ এথোল। মিঃ এথোলকে দেখে ম্যাকমারা অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি যেমন খুশি হলেন তেমনি অবাকও হলেন, কারণ ম্যাকমারা বাংলাদেশে আগমন করেছেন, তা এথোল জানলেন কি করে!

ম্যাকমারা প্রশ্ন করে বসলেন— এথোল, আমার আগমনবার্তা তোমায় কে জানলো?

একটু গম্ভীর হাসি হেসে বললেন মিঃ এথোল—তুমি বাংলাদেশে আসবে আর আমি জানবো না? ম্যাকমারা, এথোল তোমার সব সংবাদই জানে, বুঝলে? কখন তুমি কোথায় কি করছো আমার অজানা নেই।

মিঃ এথোলের কথাগুলো বেশ হেয়ালীপূর্ণ বলে মনে হলো বনহুরের কাছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো এথোলের মুখে।

এথোল জেদ ধরে বসলো— প্রথম তার ওখানেই যেতে হবে তাদের। কিন্তু মিঃ আলবার্ড নাছোড় বান্দা; তিনি ধরে বসেছেন— বহুদিন পর ভাই-এর সাক্ষাৎলাভ ঘটেছে কিছুতেই তিনি ছেড়ে দেবেন না, বিশেষ করে প্রথমে তার ওখানেই আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে।

কমিশনার বিনয় সেন অবশ্য তেমন জেদ ধরে না বসলেও ওখানে যেতে হবে এ সুনিশ্চয়।

ম্যাকমারা রাজী হলেন প্রথম তিনি তাঁর দাদা আলবার্ডের ওখানেই যাবেন।

পার্ক সার্কাস আলবার্ডের তিন তলা বাড়ি।

বড় হলঘরটার পাশের কামরায় বনহুর আর অন্যান্য ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন আলবার্ড। আর ম্যাকমারা ও শ্যালনের জন্য আলবার্ড তিন তলায় নিজের শয়নকক্ষের পাশে কামরায় জায়গা করে দিলেন। বহুদিন পর ভাইকে তিনি পেয়েছেন, খুশিতে উপচে পড়লেন যেন আলবার্ড।

বনহুর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে আসছে প্রায় আফ্রিকার জঙ্গল থেকে। ব্যাপারটা হলো এই— ম্যাকমারা কোনো সময় তাঁর দেহের বসন উন্মোচন

করতেন না। তিনি সর্বক্ষণের জন্য একটা জামা পড়ে থাকতেন। জামাটা তিনি কোনোদিন পরিষ্কার করতেন বলেও মনে হয় না।

জামাটা তাঁর সর্ব নীচে পরা থাকতো, এমনকি গেঞ্জিটাও তিনি ঐ জামার উপরে পরতেন। এ ব্যাপার নিয়ে প্রফেসার ম্যাকমারার ছাত্রদের মধ্যে বেশ একটা উৎসুক ভাব ছিলো কিন্তু কেউ সে ব্যাপারের সমাধান খুঁজে পায়নি।

বনহুর পর্যন্ত এ ব্যাপারে শ্যালনকে প্রশ্ন করেছিলো — আচ্ছা শ্যালন, তোমার আব্বার দেহটা তুমি দেখেছো কোনোদিন?

শ্যালন হেসে বলেছিলো— কেন বলো তো?

বনহুর বলেছিলো— তোমার আব্বা সর্বক্ষণ একটা জামা গায়ে রাখেন, তিনি কি ঐ জামাটা কোনোদিন পরিষ্কার করেন না?

না। এ ব্যাপারে আমিও বাবাকে অনেক বলেছি। কিন্তু বাবা কোনোদিন ঐ জামা পাল্টান না বা পরিষ্কার করেন না।

বনহুর অস্ফুটকণ্ঠে বলেছিলো—আশ্চর্য!

তারপর আর কোনোদিন এ ব্যাপারে সে আগ্রহশীল ছিলোনা। কারণ নানা মানুষের নানা ধরণের স্বভাব! ম্যাকমারার হয়তো ওটা অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়।

বনহুর অনেকদিন এমন নরম বিছানায় শয়ন করেনি। মিঃ আলবার্ডের আতিথ্যে খুশি হলো বনহুর। খাওয়া-দাওয়ার পর পরম নিশ্চিন্তে শয্যা গ্রহণ করলো সে।

অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর।

রাত বেড়ে আসছে।

কলকাতা নগরী এক সময় ঝিমিয়ে এলো। রাজপথ প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে।

কোনো এক গির্জা থেকে রাত চারটা বাজার ঘন্টাধ্বনি হলো।

ঠিক সে মুহূর্তে তীব্র একটা আর্তনাদ শোনা গেলো আলবার্ডের বাড়ির তিন তলা থেকে।

ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের, বিদ্যুৎ গতিতে বিছানায় উঠে বসলো, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো নারীকণ্ঠের আর্ত-চীৎকার। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে উপরে ছুটলো, কিন্তু যেদিক থেকে আর্তনাদ এবং নারীকণ্ঠে, চীৎকার শোনা গিয়েছিলো সেদিকে না গিয়ে ছুটে গেলো বনহুর মিঃ আলবার্ডের শয়নকক্ষের দিকে এবং দরজায় এসে দাঁড়াতেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন আলবার্ড, নিদ্রাজড়িত ভয়ার্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন— মিঃ আলম আপনি!

হাঁ, এ দিকে কোথাও তীব্র আর্তনাদ শোনা গেলো-------

ব্যস্তকণ্ঠে বললেন আলবার্ড— আমিও সে রকম শুনলাম। চলুন দেখি আমার বাড়ির কোথায় কার কি দুর্ঘটনা ঘটেছে----

তখনও একটা গোঙ্গানীর মত শব্দ ওদিকের কামরা থেকে ভেসে আসছে। বনহুর আর মিঃ আলবার্ড ছুটে গেলো পাশের কামরার দরজায়। আলবার্ড বলে উঠলেন—এ কক্ষেই তো ম্যাকমারা আর শ্যালন আছে।

দরজায় চাপ দিতেই খুলে গেলো।

কক্ষে প্রবেশ করলেন আলবার্ড আর বনহুর।

বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন আলবার্ড—খুন!

বনহুর তাকিয়ে দেখলো— ওদিকের বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে শ্যালন আর এদিকের খাটের নীচে মেঝেতে রক্তাপ্লুত অবস্থায় উবু হয়ে পড়ে আছেন ম্যাকমারা। একখানা ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে তাঁর পিঠে। বনহুর আরও অবাক হয়ে দেখলো— ম্যাকমারার দেহে তাঁর এতো সাধের সেই তেলচিটে জামাটা নেই।

মিঃ আলবার্ড ম্যাকমারার রক্তাক্ত দেহের উপর মাথা রেখে রোদন করে চলেছেন।

ততক্ষণে বাড়ির অন্যান্য লোকজন এবং চাকর-বাকর সবাই ছুটে এসে জড়ো হয়েছে। হঠাৎ একটা খুনের দৃশ্য লক্ষ্য করে সকলের মুখ ভয়ার্ত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

এমন সময় অতর্কিতে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ এথোল। তাঁর পেছনে কমিশনার বিনয় সেন আর পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ রাজেন্দ্রনাথ এবং কয়েকজন পুলিশ।

বললেন এথোল—স্যার, দেখুন আমার কথা সত্য কিনা। আমি জানতাম, আজ রাতেই ম্যাকমারা খুন হবে এবং সে সন্দেহেই আমি ম্যাকমারা ও তাঁর কন্যাকে আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য কাউকে রেহাই দেয় না----------

আলবার্ড অশ্রুপূর্ণ নয়নে উঠে দাঁড়ালেন, মিঃ বিনয় সেন ও মিঃ রাজেন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

এথোল গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন— মিঃ আলবার্ড তার ভাইকে হত্যা করেছে।

কক্ষমধ্যে যেন বাজ পড়লো।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো মিঃ এথোল এবং পুলিশ কমিশনার মিঃ বিনয় সেন ও ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথের মুখে।

এথোলের কথায় ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ আলবার্ডের হস্তে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

বিনয় সেন বললেন— আহা, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে, তোমরা ওকে দেখ।

কয়েকজন পুলিশ শ্যালনের দিকে এগুতেই বনহুর বললো— ওর জন্য ঘাবড়াবার কিছু নেই, অজ্ঞান হয়ে গেছে— একটু পরেই জ্ঞান ফিরে আসবে। বনহুর নিজে শ্যালনের চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগলো। একটা চাকরকে পানি আনার জন্য ইংগিত করলো বনহুর।

সামান্য কয়েকটা ঘন্টার মাত্র ব্যবধান— তারই মধ্যে কি সর্বনেশে কাণ্ডটাই না ঘটে গেলো!

আজ সন্ধ্যার পর তারা সবাই মিলে যখন আলবার্ডের বাড়িতে আগমন করেছিলেন তখন কত আনন্দই না প্রকাশ করেছিলেন আলবার্ড, এবং সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ডিনার খাইয়েছিলেন। সবাই মিলে যখন বিদায় গ্রহণ করেছিলেন তখন রাত বারোটা প্রায় বেজে গিয়েছিলো।

মিঃ বিনয় সেন যখন বিদায় নিয়ে গাড়ির দিকে এগুচ্ছিলেন তখন ম্যাকমারা ফিস ফিস করে তাঁর কানে কিছু বলেছিলেন— এটা আর কেউ লক্ষ্য না করলেও বনহুর করেছিলো। বিনয় সেনকে ম্যাকমারা শেষ বারের মত কি বলেছিলো তা একমাত্র নিহত ম্যাকমারা আর পুলিশ কমিশনার বিনয় সেন ছাড়া আর কেউ জানে না। কি এমন গোপন কথা তিনি বন্ধুর কাছে বলেছিলেন তিনিই জানেন। তারপর বনহুর শয্যা গ্রহণের পর অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর্তনাদের শব্দে যখন তার ঘুম ভাংলো তখন রাত চারটে।

একটা বয় পানি এনে বনহুরের হাতে দিলো, সে তখন শ্যালনের চোখে ঝাপটা দিতে লাগলো। অল্পক্ষণে শ্যালনের জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হলো না বনহুরের।

মিঃ বিনয় সেন এবং মিঃ রাজেন্দ্রনাথ ম্যাকমারার লাশ পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

আলবার্ডের হাতে তখন হাতকড়া লাগানো হয়ে গেছে। তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছেন, এবং মাঝে মাঝে উচ্চারণ করছেন—ঈশ্বরের শপথ, আমি আমার ভাইকে হত্যা করিনি-- আমার ভাইকে আমি হত্যা করিনি--

মিঃ এথোল ক্রুদ্ধভাবে বলছেন--তুমি মিছেমিছি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছো। তুমি যদি ম্যাকমারাকে হত্যা না করবে তাহলে কেন তাকে জেদ করে তোমার বাড়িতে নিয়ে এলে? আমার বাড়িতে তাকে যেতে দিলে না কেন তবে বলো? নিশ্চয়ই এ তোমার কাজ।

পুলিশ অফিসারদ্বয়ের লাশ পরীক্ষা এবং ডায়রী লেখা শেষ হলে, বনহুর তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো সে এথোলকে লক্ষ্য করে— মিঃ এথোল, আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন না করে পারছিনে। বলুন আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবেন?

বলুন, যদি দেবার মত প্রশ্ন হয় নিশ্চয়ই দেবো!

দেখুন, ম্যাকমারা খুন হয়েছে রাত্রি চারি ঘটিকায়, আর আপনি পুলিশ কমিশনার এবং ইন্সপেক্টার সাহেবকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ঠিক রাত্রি সাড়ে চারটায়। মাত্র অর্ধঘণ্টা সময়ে আপনি এখানে এসে পৌঁছেছেন। তাতে মনে হয় ম্যাকমারা রাত্রি চারি ঘটিকায় খুন হবেন, এ কথা আপনি জানতেন?

হাঁ জানতাম, জানতাম বলেই আমি ম্যাকমারার বিশিষ্ট বন্ধু মিঃ সেন এবং ইন্সপেক্টারকে নিয়ে পার্ক সার্কাস রওয়ানা দিই কিন্তু তার পূর্বেই খুনী তার কাজ শেষ করে ফেলেছে।

কি করে আপনি জানলেন—ম্যাকমারা আজ রাতে নিহত হবেন?

সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। আপনি বুঝি আমাকে সন্দেহ করছেন?

মোটেই না।

তবে আমাকে এভাবে প্রশ্ন করার কি মানে হয়?

আমাকে ক্ষমা করবেন। তবে হাঁ, পুলিশ আপনাকেও রেহাই দেবে না।

বিনয় সেন হাসলেন—ধন্যবাদ মিঃ আলম। আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ এথোলকেও আমরা এতো সহজে ছেড়ে দেবো না।

পুলিশ অফিসে তাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

সেদিন এর বেশি আর কিছু জানা সম্ভব হলো না বনহুরের পক্ষে। ম্যাকমারার লাশ পোষ্ট-মর্টমের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ ইন্সপেক্টার দলবল নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ততক্ষণে শ্যালনের জ্ঞান ফিরে এসেছে।

সে বনহুরকে বারবার প্রশ্ন করছে—তার বাবা কেমন আছেন।

তিনি বেঁচে আছেন তো?

বনহুর সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে—হাঁ, তোমার বাবা জীবিত আছেন।

তাঁকে হসপিটালে রাখা হয়েছে।

❑

বনহুর কক্ষমধ্যে পায়চারী করছে আর সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে। কক্ষমধ্যে ধূম্ররাশি ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে এক যজ্ঞকুণ্ডের আকার ধারণ করেছে। বনহুরের ললাটে গভীর চিন্তা-রেখা ফুটে উঠেছে। সে ভাবছে প্রফেসার ম্যাকমারার হত্যা-রহস্যের কথা— ভাবছে

তাঁর গায়ের ছোট্ট জামাটার কথা। নিশ্চয়ই ম্যাকমারার জামাটাই তাঁর হত্যার কারণ। কিন্তু কেন, কি ছিলো তাঁর জামার মধ্যে...

বনহুর থমকে— দাঁড়ায়, অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে পুনঃ আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে বাইরে। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, বনহুর গাড়ির ড্রাইভ-আসনে চেপে বসলো।

কলকাতা নগরী তার কাছে নতুন হলেও একদিনে সে শহরের বহু স্থানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছে। ডায়মণ্ড হারবার থেকে দমদম পর্যন্ত সে ঘুরেফিরে দেখেছে। আলিপুর, বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, ভবানীপুর, ধর্মতলা, বৌবাজার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়াম, এমনকি সে মনুমেন্টের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে গিয়েছে। বনহুর আজ পার্ক-সার্কাস রোড হয়ে ধর্মতলার দিকে অগ্রসর হলো। হাতঘড়ির দিকে একবার দেখে নিলো বনহুর,— রাত একটা বিশ মিনিট। শীতের রাত নয়; গ্রীষ্মকাল— কাজেই রাত একটায় কলকাতা নগরী সন্ধ্যা রাতের মতই গমগম করছে। তবে ছোট-খাটো সঙ্কীর্ণ গলিপথগুলো নীরব নিঝুম হয়ে পড়েছে।

বনহুরের গাড়ি ধর্মতলা রোড ত্যাগ করে বেনিয়া পুকুর রোডে প্রবেশ করলো। এটা খুব বড় রাস্তা নয়, তবু দোকানপাট যথেষ্ট রয়েছে; মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী লোকদের বাড়িও দেখা যায়। বেনিয়া পুকুর হয়ে লোয়ার চিৎপুর রোড দিয়ে বৌবাজারের মোড়ে এসে বনহুর গাড়ি রাখলো। আবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুর। এতোটা পথ আসতে তার সম্পূর্ণ এক ঘন্টা সময় লেগেছে। অনেক ঘুরেফিরে এপথে-সেপথে তাকে আসতে হয়েছে।

বৌবাজারের অদূরে চৌমাথায় একটা মাঝারী রকমের বাড়ি। বনহুর দূর থেকে লক্ষ্য করলো বাড়িটার সবগুলো কামরার জানালা— কপাট বন্ধ।

বনহুরের গাড়ি থেকে প্রায় একশত হাত দূরে সেই বাড়িখানা। এ বাড়িই মিঃ এথোলের। বনহুর আশ্চর্য হলো— এতোবড় ধনবান লোক হয়ে ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকেন, ব্যাপার কি!

অবশ্য বনহুর এথোলের বাড়ির সন্ধান লাভ করেছিলো আলবার্ডের এক বয়ের কাছে। কয়েকদিন ধরে বনহুর সকাল-সন্ধ্যা দ্বিপ্রহর আলবার্ডের একটি শিক্ষিত বয়কে সঙ্গে করে কলকাতার প্রায় বহু জায়গা চষে ফিরেছে।

আলবার্ড এখন হাজতে।

বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী এবং দুই সন্তান ছাড়া আর কেউ আপন জন নেই। তবে আলবার্ডের কারবার অনেক, ইণ্ডাষ্ট্রি আছে যথেষ্ট। কর্মচারী, দাস-দাসী চাকার-বাকরের অভাব নেই। প্রত্যেকটা ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য ম্যানেজার

এবং বিভিন্ন কর্মচারী রয়েছে। আলবার্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র আর্থার শিক্ষিত এবং জ্ঞানবান যুবক—প্রায় বনহুরের সমবয়সী। বনহুরের বেশ ভাব জমে গেছে আর্থারের সঙ্গে। সে নিজে বনহুরকে সহায়তা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে তার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য। আর্থারের বিশ্বাস, তার বাবা কাকা ম্যাকমারার হত্যাকারী নয়।

আজ সকালে বনহুর আলবার্ডের বয় পিলুকে সঙ্গে করে দেখে গেছে মিঃ এথোলের বাড়িটা। কিন্তু এখন আশ্চর্য হলো বনহুর— পিলু তাকে ধোকা দিয়েছে, এ বাড়িতে কেউ বাস করে বলে মনে হলো না। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বনহুর ভালোভাবে লক্ষ্য করলো, সত্যিই এ বাড়ি তালাবন্ধ। বনহুর তার গাড়ি নিয়ে বাড়িটার দরজায় এসে দাঁড়ালো। বহুদিন বাড়িখানা মেরামত না করার দরুণ বাড়িটা জিরজিরে মনে হচ্ছিলো।

বনহুর এবার গাড়ি থেকে নেমে পড়লো, পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করে বাড়ির দরজায় যে তালা লাগানো ছিলো তাতে একটির পর একটি লাগিয়ে চললো। বাড়িখানা এমন স্থানে যেখানে তেমন কোনো লোকজনের ভীড় নেই।

অল্পক্ষণেই তালা খুলে গেলো; বনহুর সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলো। জমাট অন্ধকার, বাড়ির কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এগুতে লাগলো বনহুর। বাড়িটা তো তার জানাশোনা নেই, কাজেই বারবার হোচট্ খেয়ে পড়ে যেতে গিয়ে বেঁচে যাচ্ছিলো। আর খানিকটা এগুতেই হঠাৎ একটা ফিস্‌ফিস্ চাপা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেলো।

থমকে দাঁড়ালো বনহুর।

দ্বিতলের কোনো কক্ষ থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছে।

বনহুর জানেনা, এ বাড়ির দ্বিতলে উঠার সিঁড়িটা কোন্ ধারে। তবু ভালভাবে সন্ধান করে চললো, অল্পসময়েই পেয়ে গেলো সিঁড়িটা। বনহুর পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারখানা বের করে দক্ষিণ হস্তে চেপে ধরলো। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো সে এবার।

সিড়ির শেষ ধাপে পা রাখতেই বনহুর বুঝতে পা লো—প্রশস্ত একটা টানা বারান্দা সোজা চলে গেছে উত্তর দিকে। ওদিকের কোণের একটা কক্ষ থেকেই আওয়াজটা আসছিলো। বনহুর অগ্রসর হলো। কথার আওয়াজ লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো সে। সাবধানে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো, কক্ষমধ্যে দু'জন ফিস্ ফিস্ করে আলাপ করছে স্পষ্ট বোঝা গেলো।

বনহুর দরজায় কান লাগিয়ে কথাবার্তা বুঝবার চেষ্টা করলো, কিন্তু যে ভাষায় কথাবার্তা চলছে তা বাংলা বা ইংরেজি ভাষা নয়। চীনা, জাপানী ভাষাও নয়— কি ভাষা তা বনহুর বুঝতে পারলোনা।

বনহুর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওদিকের শার্শীতে চাপ দিয়ে খুলে ফেললো, এবং লাফিয়ে পড়লো কক্ষমধ্যে। দক্ষিণ হস্তে তার গুলী ভরা রিভলভার।

কক্ষ অন্ধকার!

বনহুর এবার পকেট থেকে টর্চ বের করে আলো জ্বালালো। আশ্চর্য হয়ে গেলো সে— কক্ষ শুন্য! কিন্তু তখনও কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বনহুর বিস্মিত হয়ে দেখলো— কক্ষের এক কোণে একটা টেবিলের উপর টেপ্ রেকর্ড চালু করা রয়েছে। সেই টেপ্ রেকর্ডের কথাবার্তাই এতোক্ষণ বনহুর শুনতে পাচ্ছিলো। বনহুর এবার সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। কক্ষটি খুব বড় নয়। মূল্যবান আসবাব বলতে একটি খাট, একটি টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার। এক পাশে একটা আলমারী, আলমারীর মধ্যে কিছুসংখ্যক বই।

বনহুর আলমারীটা খুলে ফেললো। এক একখানা বই হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে আবার স্বস্থানে রেখে দিলো। প্রায় অনেকগুলো বই সে মেলে মেলে দেখলো। নানা ভাষার বই সে দেখলো আলমারীটাতে।

আলমারী বন্ধ করতেই দরজা খুলে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ এথোল। বনহুরকে দেখে কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে বললেন— বাইরে আলবার্ডের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝেছিলাম আপনি এসেছেন।

বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এথোলের মুখের দিকে।

এথোল ঠিক পূর্বের মতই স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন—বসুন।

বনহুর আসন গ্রহণ না করে গম্ভীর গলায় বললো— এটাই বুঝি আপনার বাড়ি?

কেন, সন্দেহ ছিলো নাকি?

হাঁ, আপনি নামকরা একজন ধনবান লোক অথচ আপনার এ রকম বাড়ি— আমি ভাবতে পারিনি।

বসুন, বলছি।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

এথোল সিগারেট-কেসটা বের করে বনহুরের সম্মুখে এগিয়ে ধরলেন— নিন।

বনহুর আলগোছে একটা সিগারেট তুলে নিলো এথোলের সিগারেট-কেস থেকে। কিন্তু সে এথোলের অলক্ষ্যে সিগারেটটা নিজের পকেটে রেখে, নিজস্ব একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো।

এথোলও তার নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একরাশ ধূয়া নির্গত করলেন।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন— এতো রাতে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মনে কিছু করবে না!

নিশ্চয়ই আমি খুশী হয়েছি, এবং আমি আপনার নিকটেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনাকে না পেয়ে বাসায় ফিরে এলাম। অবশ্য জানতাম, আপনি এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বনহুর আরও অবাক হলো, বললো— কি করে আপনি জানলেন, আমি আপনার জন্য আপনার বাড়িতে অপেক্ষা করছি!

এ সহজ কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে—আশ্চর্য ছেলে তুমি! দেখ আলম, তোমাকে তুমি বললাম বলে মনে কিছু করোনা।

নিশ্চয়ই না। কিন্তু আপনি জানেন আমি আপনার কাছে কেনো এসেছি?

বৎস, আমি জানবো না! দেখো আলম— তুমি আমাকে সন্দেহ করেছো—আমিই হয়তো বন্ধু ম্যাকমারা হত্যা-রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছি।

সন্দেহ নয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন— কে আপনার বন্ধু ম্যাকমারাকে হত্যা করেছে?

হেসে উঠলেন এথোল— ছেলেমানুষ তোমরা, গভীর রহস্য বুঝতে এখনও তোমাদের অনেক বিলম্ব আছে।

আপনি কি বলতে চান, ম্যাকমারা হত্যা-রহস্য ব্যাপার আপনি জানেন না?

না। তবে জানি—কেন সে নিহত হয়েছে।

কেন সে নিহত হয়েছে আপনি না বললেও আমি জানি।

হেসে উঠলেন আবার এথোল— মিথ্যা কথা, কেন ম্যাকমারা নিহত হয়েছে— একমাত্র আমি আর হত্যাকারী ছাড়া কেউ জানে না।

আপনি শুনতে চান কেন ম্যাকমারা হত্যা হয়েছে?

আমি জানি—তুমি জানো না। শুধু তুমি কেন, তার কন্যাও জানেনা। আলম, তুমি স্থির হয়ে বসো— কয়েকটা কথা আমি তোমাকে বলবো। হয়তো কথাগুলো বলার পর আমারও মৃত্যু ঘটতে পারে।

বনহুরের কাছে ঘটনাগুলো ক্রমেই আরও রহস্যময় বলে মনে হতে লাগলো।

এথোল তাঁর হস্তের অর্ধদগ্ধ সিগারেটে শেষবারের মত টান দিয়ে সিগারেটটা মেঝেতে ফেললেন, তারপর পায়ের তলায় ফেলে বুট দিয়ে পিষে নিবিয়ে দিলেন।

বনহুর অবাক হলো আরও। টেবিলে এ্যাসট্রে অথচ মিঃ এথোল তাঁর উচ্ছিষ্ট সিগারেট এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ না করে মেঝেতে ফেললেন কেন, এবং

বুট দিয়ে এমনভাবে পিষে ফেললেন— যেন এতোটুকু চিহ্ন না থাকে! টেবিলে এ্যাসট্রে সম্পূর্ণ ফাঁকা।

বনহুর এ্যাসট্রে লক্ষ্য করছে দেখে মিঃ এথোল বললেন— আমার এ্যাসট্রে পরিষ্কার করবার লোক নেই এখানে, তাই আমি ------কথা শেষ না করে গম্ভীর হলেন।

বনহুর কিছু চিন্তা করছিলো।

মিঃ এথোল বললেন আবার— আলম, আমি এইমাত্র পার্ক সার্কাসে গিয়েছিলাম তোমার সন্ধানে। কিন্তু তোমাকে না পেয়ে আমি উৎকণ্ঠিত হইনি, কারণ আমি জানি—তুমি আমার এখানে এসেছো। তারপর ফিরে যখন দরজায় আলবার্ডের গাড়ি দেখলাম তখন আমার ধারণা স্থির হলো। হাঁ, তুমি হয়তো ভাবছো— এতোবড় বাড়ি অথচ লোকজন নেই কেন? আসলে শুধু এটাই আমার বাড়ি নয়, ডালহৌসী স্কয়ারে আমার মস্ত বড় বাড়ি আছে— সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজন-পরিবার সব আছে। তুমি হয়তো জানোনা— আমি একজন বৈজ্ঞানিক।

বনহুর বলে উঠলো— আপনি বৈজ্ঞানিক?

হাঁ, এই পাশের কামরায় আমার ল্যাবরেটরী। সারাদিন আমি আমার সাধনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, বাড়িতে নানা অসুবিধার জন্য এখানে এ বাড়িটা আমি বেছে নিয়েছি। আমাকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়, তাই আমি বাড়ির দরজায় তালা বন্ধ করে যাই। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে তুমি আরও অবাক হয়েছো।

হাঁ, আপনি বেশ বুদ্ধি করেছেন, বাসায় আপনি নেই অথচ কথাবার্তা চলছে আপনার ঘরে।

ঠিক বলেছো। আমি টেপরেকর্ডে এমন এক ভাষার সৃষ্টি করেছি যা আমাদের বাংলাদেশের লোক বুঝতে পারবে না। কলকাতা শহর— চোর-জোচ্চোরের তো অভাব নেই, কাজেই আমি এ ব্যবস্থা করেছি।

হেসে বললো বনহুর— সত্যি, আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছিনে।

যাক, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, কেন আমি আমার বাড়িতে এ রকম ব্যবস্থা করেছি।

হাঁ, পেরেছি। কিন্তু আপনি এতো রাতে আমার সন্ধানে পার্ক সার্কাসে কেন গিয়েছিলেন— তা জানতে পারি কি?

যে কারণে তুমি এসেছো আমার সন্ধানে?

বনহুর অবাক হলো এথোলের কথায়। মনোভাব গোপন করে বললো সে— ম্যাকমারার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করাই হলো আমার উদ্দেশ্য

ঠিক আমারও তাই।

আপনি কি আমাকে প্রফেসার ম্যাকমারার হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন?

তুমি যেমন আমাকে সন্দেহ করছো, ঠিক ঐ রকম একটা সন্দেহের ছোঁয়া আমার মনেও দোলা জাগাচ্ছে। কিন্তু যাক্ সে সব কথা— এখন কাজের কথায় আসা যাক।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে নিশ্চুপ আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

এথোল হেসে বললেন— আমি যে সিগারেটটা তোমাকে দিয়েছিলাম নিঃসন্দেহে পান করতে পারো।

বনহুর চমকে উঠলো, — তবে এথোল তার কার্যকলাপ টের পেয়েছেন। সে যে সিগারেটটা পান না করে পকেটে রেখেছে তা তিনি বুঝতে পারলেন কি করে? বনহুর বললো— আমি নিজের সিগারেট ছাড়া অন্য কোনো সিগারেট পান করিনে।

ধন্যবাদ! তোমার বুদ্ধিমত্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। হাঁ, তোমার সহায়তা পেলে আমি ম্যাকমারার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবো।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো মিঃ এথোলের মুখে।

মিঃ এথোল আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কিছুক্ষণ পায়চারী করে কি যেন ভাবলেন।

বনহুর সিগারেটের ধূম্ররাশির ফাঁকে সব লক্ষ্য করছিলো। এথোলের কথাবার্তা এবং আচরণ তাকে আরও ভাবিয়ে তুলেছিলো।

মিঃ এথোল হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে বললেন— তুমি আমার বন্ধুবর ম্যাকমারার ভাবী জামাতা, কাজেই তোমার কাছে না বলার বা লুকোবার কিছু নেই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললো বনহুর এথোলের মুখে।

মিঃ এথোল বলতে শুরু করলেন— সেদিন রাতে আলবার্ডের বাড়ি থেকে আমন্ত্রণ খেয়ে আমরা যখন বিদায় নিচ্ছিলাম তখন আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছিলো ম্যাকমারা— এথোল, তুমি আমার পরম আত্মীয়— তোমাকে আমার মনের কথা বলবো। আমি বলেছিলাম, বলো? ম্যাকমারার মুখ তখন বেশ করুণ এবং ভয়ার্ত দেখাচ্ছিলো। আমার কথায় সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলেছিলো— এথোল, বাংলাদেশে এলাম কিন্তু বাংলার মাটি আমাকে সহ্য করতে পারছেনা। আমি বুঝতে পারছি মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আজ রাতটা যদি আমি জীবিত থাকতে পারি তাহলে হয়তো আমি বাঁচলেও বাঁচতে পারি। আমি হেসে

বলেছিলাম—বাজে কথা ভেবে মন খারাপ করছো। কি এমন কাজ করেছো যার জন্য তোমার মৃত্যু ঘটতে পারে! সে কথার কোনো জবাব দেয়নি ম্যাকমারা, তার চোখে-মুখে একটা আশঙ্কাপূর্ণ ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিলাম তখন।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো তার আসনে—তারপর?

আমি বলেছিলাম— তোমার যদি এতো ভয় তবে আমার ওখানে চলো। কিন্তু ম্যাকমারা আমার কথার কোনো জবাব দিলোনা। হাঁ, তারপর আমরা চলে এসেছিলাম।

কিন্তু আবার ঠিক সময় আপনি হাজির হয়েছিলেন।

শুধু আমি নই, পুলিশ কমিশনার স্বয়ং আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন, আরও ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার এবং কয়েকজন পুলিশ।

আপনি কি করে অনুমান করলেন—আপনার বন্ধুবর ম্যাকমারা সত্যিই নিহত হবেন বা হয়েছেন?

আলবার্ডের বাড়ি থেকে বাসায় ফিরে আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিলাম না। যতই ভাবছিলাম ম্যাকমারার কথাগুলো, ততই যেন কেমন অস্থির হয়ে পড়ছিলাম; কিছুতেই ঘুমাতে পারছিলাম না। রাত তখন তিনটে কিংবা সাড়ে তিনটে— আমি বাথরুমে প্রবেশ করলাম। বাথরুম থেকে হঠাৎ শুনতে পেলাম আমার টেবিলে ফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দ করে বেজে উঠলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে যখন ফোন ধরলাম তখন আমার হাতঘড়িতে চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকী। রিসিভার হাতে তুলে নিতেই শুনতে পেলাম বন্ধু ম্যাকমারার ব্যাকুল ভয়ার্ত কণ্ঠ— হ্যালো, হ্যালো, এথোল—এথোল---- আমিও জবাব দিলাম — হ্যলো স্পিকিং এথোল ---- কিন্তু কি হলো— আর কোনো শব্দ শুনতে পেলামনা। বার বার ম্যাকমারার নাম ধরে ডাকলাম কিন্তু কোনো সাড়া নেই, ভালভাবে শোনার চেষ্টা করলাম রিসিভার কানে লাগিয়ে — মনে হলো একটা ধস্তাধ্বস্তির ক্ষীণ শব্দ ফোনের মধ্যে ভেসে আসছে। পরক্ষণেই আর একটি শব্দ শুনলাম—নারীকণ্ঠের আর্তনাদের ক্ষীণ শব্দ---

বনহুর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছিলো মিঃ এথোলের কথাগুলো। এবার বললো বনহুর— হাঁ, আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে— ম্যাকমারার কক্ষে টেবিলে রিসিভারখানা এক ধারে ঝুলছিল এবং আপনি তা সকলের অলক্ষ্যে স্বস্থানে তুলে রেখেছিলেন।

আমি---হাঁ হাঁ রেখেছিলাম---- কি জানি কেন যে আমি ও কাজ করতে গিয়েছিলাম। একটু থতমত খেয়ে গেলেন এথোল।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পকেট থেকে রিভলভার বের করে ধরলো মিঃ এথোলের বুকে— সঠিক করে বলুন, কেন তাকে হত্যা করেছেন?

এবার এথোল এতোটুকু বিচলিত হলেন না, অট্টহাসি হেসে বললেন— বৎস, তুমি দেখছি আমাকেই খুনী বানিয়ে বসেছো। যদি বলি, তুমি তাকে হত্যা করেছো।

আমি!

হাঁ, তুমি রাতে ঐ বাড়িতেই ছিলে কিনা। দেখ আলম, একটি কথা মনে রেখো— খুনীকে এখনও আমরা কেউ জানিনা। তবে তোমার চেয়ে আমি একটু বেশি জানি, কারণ ম্যাকমারা কেন খুন হয়েছে একথা আমার জানা নেই। তুমি যা এখনও জানোনা।

ঠিক বলেছেন, আমি জানিনে কেন সে খুন হয়েছে এবং কে তাকে খুন করেছে।

তাহলে মিছেমিছি আমাকে এভাবে অপদস্ত করার মানে কি হয় বলো? মিঃ এথোল বনহুরের রিভলবারের মাথাটা ধরে সরিয়ে দেয়।

বনহুর বলে উঠলো এবার— বলুন, কেন ম্যাকমারা খুন হয়েছে?

কিন্তু আমার আপত্তি আছে কথাটা বলতে।

তাহলে আমার হাতে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

তুমি ছেলেমানুষ, একটুতেই উতলা হচ্ছো, সবুর করো— সব জানতে পারবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমার সহায়তা ছাড়া কেউ ম্যাকমারার হত্যাকারীকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না।

সেদিন মিঃ এথোলের কাছে এর বেশি জানা সম্ভব হলোনা। বনহুর বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলো।

গাড়িতে উঠে বনহুর সুইচ টিপে গাড়ির ভিতরে আলো জেলে ফেললো এবং সম্মুখের ছোট্ট আয়নাখানা বাঁকিয়ে নীচু করে নিলো, যাতে পিছন আসনের সব স্পষ্ট দেখা যায়।

আয়নাটা নীচু করে নিয়ে তাতে দৃষ্টি ফেলতেই বনহুর দেখতে পেলো— তার গাড়ির পিছন আসনের তলায় উবু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কেউ বসে আছে। আশ্চর্য হলো না বনহুর, কারণ সে জানে এমন থাকা স্বাভাবিক।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো, ইতিমধ্যে বনহুর আয়নাটাক আরও নীচু করে নিয়েছে। বনহুর সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কে একজন নিশ্চুপ বসে আছে গুটিসুটি মেরে।

বনহুর পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারের অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো। তার রিভলভারে দু'টি গুলী মজুত রয়েছে। কে এ লোক— কি এর অভিসন্ধি? বনহুর পার্ক সার্কাস রোডের দিকে না গিয়ে সোজা গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে

নিলো ধর্মতলা রোডের দিকে। তারপর মেছো বাজার বড় বাজার হয়ে এলোপাথাড়ি হয়ে এগিয়ে চললো গঙ্গার দিকে।

গঙ্গার ধারে এসে গাড়ি রাখলো বনহুর, তারপর পকেট থেকে রিভলভার বের করে পিছন আসনে উদ্যত করে ধরলো— বেরিয়ে এসো!

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো লোকটা।

বনহুর বামহস্তে পকেট থেকে টর্চ বের করে মুখে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো— শ্যালন, তুমি!

হাঁ, আমাকে মাফ করো।

বনহুর টর্চের আলো ফেলে শ্যালনের পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ্য করলো। সম্পূর্ণ একটি পুরুষের ড্রেস। বনহুর শ্যালনকে চিনতে বিলম্ব করেনি, অন্য কেউ হলে এতো সহজে তাকে নারী বলে চিনতে পারতো না।

বনহুর রিভলভার প্যান্টের পকেটে রেখে গম্ভীর গলায় বললো— শ্যালন, তুমি এ গাড়ির মধ্যে কি করতে এসেছো?

শ্যালন ভড়কে গিয়েছিলো, বনহুরের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ঢোক গিলে বললো— তুমি একা চলে এলে তাই আমি------

কখন তুমি গাড়িতে উঠেছিলে?

যখন তুমি গাড়িতে চেপে, আবার কি যেন মনে করে ভিতরে গিয়েছিলে--

হাঁ, আমি টর্চ আনতে আমার ঘরে গিয়েছিলাম।

আমি ঠিক তখন গাড়ির পিছনে চেপে বসেছি।

একাজ করে তুমি ভাল করোনি শ্যালন।

তুমি একা চলে এলে, আর আমি একা---

শ্যালন তোমার বাবার মৃত্যু হয়েছে; এখন তোমাকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে, তোমার যে শত্রু নেই তা নয়।

সেজন্যই তো আমি একা ও বাড়িতে থাকতে পারলাম না।

শ্যালন, আমাকে এখন সব সময় এখানে-সেখানে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হচ্ছে। তোমার পিতার হত্যাকারীকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করবোই করবো। বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো।

শ্যালন বলে—কিন্তু আমি ও বাড়িতে একা থাকতে পারবো না।

তাহলে আমি কি সব সময় তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখবো?

শ্যালন কোনো কথা বলে না।

বনহুর আবার বললো—তোমার পিতার হত্যাকারীর সন্ধানে আমাকে সমস্ত কলিকাতা শহর চষে ফিরতে হবে।

আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো।

শ্যালনের কথায় বনহুরের হাসি পেলো, রাগও হলো, বললো সে—তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি কাজ করতে পারবো?

কেন পারবে না, আমি তোমাকে সহায়তা করবো।

তা হয় না শ্যালন, এটা তোমার বাবার মত জীবজন্তুর ফটো তোলার ব্যাপার নয়। তোমাকে বাড়িতে থাকতেই হবে।

না, আমি পারবো না।

কি মুস্কিল হলো তোমাকে নিয়ে।

তাহলে বাবা নেই— আমার বেঁচে কি হবে।

কি করতে চাও?

গঙ্গায় ডুব মারবো।

বেশ, তাই করো।

শ্যালন আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গঙ্গায় দিকে ছুটলো।

বনহুর বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় খপ করে ধরে ফেললো শ্যালনের সরু কোমল হাতখানা।

শ্যালন এবার দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো।

বনহুর শান্ত কণ্ঠে বললো—এতো ছেলেমানুষ তুমি। শ্যালন, বেশ কথা দিলাম, তোমাকে আগলে নিয়েই ঘরে বসে থাকবো। তোমার বাবার হত্যাকারীর সন্ধান না-ই-বা হলো, কেমন?

শ্যালন কোনো কথা বললো না।

বনহুর বললো— চলো, উঠো এবার গাড়িতে।

বনহুর নিজের আসনের পাশে শ্যালনকে বসিয়ে নিলো।

গাড়ি এবার গঙ্গার তীর বেয়ে হাওড়া ব্রীজের দিকে এগুতে লাগলো।

শ্যালন বললো—কোথায় যাচ্ছো?

হাওড়া ব্রীজের উপরে যাবো।

সেখানে কেন?

তুমি দেখোনি— তাই!

ব্রীজের উপর এসে গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়ালো বনহুর, শ্যালনকে লক্ষ্য করে বললো—এসো।

ব্রীজের একপাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর শ্যালন। রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। জনশূন্য হাওড়া ব্রীজ। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রাইভেট, কার এদিক থেকে ওদিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে। হয়তো বিশেষ কোনো প্রয়োজনেই গাড়িগুলো গ্যারেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

গঙ্গার বুক সম্পূর্ণ অন্ধকার নয়। যদিও কোনো স্টিমার বা জাহাজ তখন চলাচল করছিলো না, কিন্তু গঙ্গার ভাসমান ল্যাম্পগুলো আলো বিতরণ

করছিলো। তা ছাড়া গঙ্গাতীরে থেমে থাকা নৌকাগুলো থেকে লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি গঙ্গার জলে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

বনহুর বললো— শ্যালন, কলিকাতা শহরে এই আমার প্রথম পদক্ষেপ। জানতাম না এখানে এসে আমাকে এভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। তোমার বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে না পারলে আমার স্বস্তি নেই।

জানি আমার বাবার হত্যাকারী আমারও শত্রু, তাইতো আমার এতো ভয়।

শ্যালন, তুমি যদি এমনভাবে আমাকে সব সময় আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও তাহলে আমার পক্ষে কিছুই সম্ভব নয়। বনহুর গঙ্গার জলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

শ্যালন বুঝতে পেরেছে; বনহুর অভিমান করেছে— তাই সে বনহুরের হাতখানা চেপে ধরে বললো— আর আমি তোমাকে ধরে রাখবো না, কথা বলো? কথা বলো আলম?

শ্যালন! ফিরে তাকায় বনহুর শ্যালনের মুখের দিকে।

শ্যালনের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর পকেট থেকে রুমাল বের করে শ্যালনের চোখের পানি মুছিয়ে দিলো।

শ্যালন বনহুরের বুকে মাথা রেখে ডাকলো—আলম!

বনহুর বললো— চলো শ্যালন, ভোর হয়ে এসেছে।

❑

কয়েক দিন পরের কথা।

বনহুরের গাড়ি এসে থামলো লালবাজার পুলিশ অফিসের সামনে। বনহুর নেমে সোজা পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতেই ইন্সপেক্টার মিঃ রাজেন্দ্রনাথ উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বনহুর এবং মিঃ রাজেন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করার পর বললো বনহুর— ইন্সপেক্টার সাহেব, ম্যাকমারা হত্যা ব্যাপারে আপনারা কত দূর অগ্রসর হয়েছেন জানার জন্য এসেছি।

ভাল কথা, বসুন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এ পর্যন্ত আমরা ডায়রীতে যা জানতে পেরেছি, সমস্ত আপনাকে দেখাবো। আপনি ম্যাকমারার প্রধান সঙ্গী—মানে ভাবী জামাতা, কাজেই ম্যাকমারা হত্যা-রহস্য উদঘাটনে আপনার সাহায্য আমাদেব একান্ত প্রয়োজন।

কথাগুলো বলে ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ ও সি মিঃ জয়দেব ভৌমিকে ম্যাকমারা হত্যা রহস্যের পুলিশ রিপোর্টে যতটুকু সংগ্রহ করা হয়েছে দেখাতে বললেন। আরও বললেন— ইনি ম্যাকমারার ভাবী জামাতা, এঁর কাছে কিছু গোপন করার নেই।

বনহুর লালবাজার পুলিশ অফিস থেকে যখন বের হলো তখন বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর। সোজা গাড়ি নিয়ে সে মিঃ এথোলের বাড়িমুখো রওয়ানা দিল। ইচ্ছা করেই বনহুর বৌবাজার রোড না হয়ে বেন্টিক ষ্ট্রীট হয়ে ধর্মতলা দিয়ে বৌবাজার আসতে মনস্থির করে নিলো। প্রায় ঘন্টাখানেক আঁকাবাঁকাভাবে গাড়ি চালিয়ে বৌবাজার রাস্তায় আসতেই— বনহুরের গাড়ির পাশ কেটে চলে গেলো ঠিক মিঃ এথোলের গাড়ির মত একটি কুইন কার। বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক পলকে দেখে নিয়ে ছিলো— গাড়ির মধ্যে শুধু এথোলই নন, দ্বিতীয় কোনো একজন ছিলো বা আছে তার পাশে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তো বনহুর চিনতে পারেনি!

বনহুর নিজের গাড়িখানা এথোলের বাড়িমুখো আর না নিয়ে সামনের রাস্তার বাঁকে ব্যাক করে এথোলের গাড়িকে ফলে করলো।

সম্মুখের গাড়িখানা তখন দ্রুত এগুচ্ছে। বনহুর কিন্তু সোজা এথোলের গাড়িখানাকে ফলো করলো না, সে একটু এদিক-ওদিক করে গাড়ি চালাতে লাগলো!

সম্মুখের গাড়িখানা তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

বনহুর এথোলের গাড়িখানাকে লক্ষ্য করে এ গাড়ি -সে গাড়ির পাশ কেটে নিজের গাড়ি চালাতে লাগলো।

এপথ-সেপথ দিয়ে গাড়িখানা এবার হ্যারিসন রোড ধরে ছুটছে। বনহুর ঠিক্‌ভাবে ফলো করে আসছে সামনের গাড়িখানাকে। কিন্তু বেশ দূরত্ব রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলো বনহুর। কলিকাতা শহর— যানবাহনের ভীড়ের চাপে অতি সাবধানে তাকে গাড়ি চালাতে হচ্ছিলো।

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি একভাবে চালানোর পর হঠাৎ সামনের গাড়িখানা ষ্ট্রাণ্ড রোড ধরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সম্মুখে এসে থেমে পড়লো।

বনহুরও প্রথম গাড়িখানা হতে বেশ কিছু দূরত্ব রেখে কতগুলো গাড়ির পাশে নিজের গাড়িখানা ব্রেক করে থামিয়ে ফেললো। গাড়িতে বসেই লক্ষ্য করলো— মিঃ এথোল এবং আর এক ব্যক্তি গাড়ি থেকে নেমে ভিক্টোরিয়া হলের সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত অগ্রসর হলো ভিক্টোরিয়া হলের দিকে। সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই বনহুর দেখতে পেলো—লিফটে উঠে দাঁড়িয়েছেন এথোল এবং সঙ্গের লোকটি।

বনহুর এথোলের সঙ্গীকে ঠিক চিনতে পারলো না, কারণ তার চোখে কালো চশমা, মুখে ফ্রেঞ্চকাটা দাঁড়ি। মাথায় ক্যাপ আছে। ক্যাপটা বেশ কিছুটা কাৎ হয়ে আছে সামনের দিকে! ভদ্রলোকের ঠোঁটের ফাঁকে বিলেতী পাইপ!

চকিতে একনজর দেখে নিতেই লিফ্‌টখানা অদৃশ্য হলো।

বনহুর দু'নম্বর লিফটে চেপে দাঁড়ালো।

কিন্তু আশ্চর্য দ্বিতলে কোথাও দেখতে পেলোনা বনহুর মিঃ এথোল আর তার সঙ্গী ভদ্রলোককে। পুনরায় লিফটে তিন তালায় গমন করলো। দর্শকগণের ভীড়ে সকলের অলক্ষ্যে বনহুর খুঁজে চললো তার শিকারদ্বয়কে।

বিরাট হলের ভিতরে নানা রকম শিল্পসৃষ্টির মধ্যে মিঃ এথোল আর তার সঙ্গী কোথায় যে তলিয়ে গেছে খুঁজে পেলো না বনহুর।

প্রায় ঘণ্টা দুই বনহুর সমস্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চষে ফিরলো কিন্তু তাদের সন্ধান পেলো না। এবার সে আর বিলম্ব না করে ফিরে এলো নিজের গাড়িখানার পাশে। তাকিয়ে দেখলো এথোলের গাড়িখানা অদৃশ্য হয়েছে। বুঝতে পারলো, তাকে এড়ানোর জন্যই এই প্রচেষ্টা। নিশ্চয়ই এথোল এবং তার সঙ্গী বুঝতে পেরেছিলেন তারা সে কারণেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সম্মুখে এসে তারা গাড়ি রেখে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। তার চোখে ধুলো দেয়া হলো ওদের মূল উদ্দেশ্য।

বনহুর গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার পূর্বে তার রিভলভারখানার অস্তিত্ব একবার অনুভব করে নিলো। গাড়িখানা আবার ছুটতে আরম্ভ করলো।

এবার বনহুরের গাড়ি এথোলের বাড়ি অভিমুখে চলেছে। কিন্তু বনহুর এথোলের বাড়িতে এসে দেখলো—আজ দরজায় তালা বন্ধ নেই। দরজ মুক্ত। বনহুর ভিতরে প্রবেশ করে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলো, এথোল এখনও ফেরেন নি। আর একটা ব্যাপার আজ লক্ষ্য করলো সে—বাড়িতে একটি বৃদ্ধ চাকর ঘর-দোর পরিস্কার করছে। তার কাছেই বনহুর জানতে পারলো, মিঃ এথোল এখনও আসেন নি।

আজকের মত বনহুর বাসায় ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত করে নিলো। গাড়িতে চেপে বসলো যখন তখন বেলা চারটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। ক্ষুধায় পেটের মধ্যে জ্বালা করছে। সেই সাত সকালে আজ বেরিয়েছিলো বনহুর। শ্যালন অবশ্য তার জন্য নাস্তা তৈরি করে নিয়ে এসেছিলো, এতো চাকর-বাকর থাকা সত্ত্বেও শ্যালনের এতো অনুরাগ ভালই লাগে ওর। বেচারী শ্যালন! এ দুনিয়ায় ওর আপন জন বলতে কেউ নেই—একমাত্র পিতা ম্যাকমারাই ছিলেন শ্যালনের সম্বল। মেয়েটা পিতাকে হারিয়ে কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। কাউকে সে আর বিশ্বাস করতে চায় না। যতক্ষণ

বনহুর বাসায় থাকে ততক্ষণ শ্যালন ওর পাশেই থাকে ছায়ার মত। বনহুর হয়তো ভোরে ঘুম থেকেই উঠেনি— শ্যালন এসে বসে থাকবে তার শিয়রে। হয়তো একটা বই নিয়ে পড়বে, নয় কাঁটা দিয়ে সোয়েটার বুনবে। বনহুরের জন্য সে একটা সুন্দর প্যাটার্ণের সোয়েটার তৈরি করেছে। বনহুর জেগে উঠলে শ্যালন উঠে পড়তো, হেসে এগিয়ে গিয়ে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে তার গণ্ডে এঁকে দিতো চুম্বন রেখা। এতে সে কোনো রকম সংকোচ বা দ্বিধা বোধ করতো না বনহুরও ওকে বাধা দিতো না এ ব্যাপারে, যদিও সে নিজে কিছুটা সঙ্কোচিত হতো।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করলে শ্যালন ওর জন্য নিজ হস্তে নানা রকম নাস্তা তৈরি করে এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখতো, যতক্ষণ বনহুর বাথরুম থেকে ফিরে না আসে ততক্ষণ সে টেবিলের পাশে বসে সোয়েটার বুনতো বা বই পড়তো।

বনহুর বাথরুম থেকে ফিরে এলে তাকে চা-নাস্তা পরিবেশন করে নিজেও খেতো। ওর সঙ্গে যতক্ষণ বনহুর কক্ষে থাকতো ততক্ষণ শ্যালন নানা গল্প-সল্প আর নানা আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠতো।

মাঝে মাঝে আলবার্ডের পুত্র আর্থার এসে যোগ দিতো বনহুর আর শ্যালনের সঙ্গে। আর্থার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বনহুর আর শ্যালনের সঙ্গে গভীরভাবে ভাব জমিয়ে নিয়েছিলো।

আর্থার বলেছিলো বনহুর আর শ্যালনকে— আমাদের বাড়ি মনে করবে তোমাদের বাড়ি। এখানে তোমাদের মত হাজার জন থাকলেও আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া মিঃ আলম, আপনি আমার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য এতো চেষ্টা করছেন। আমার বাবা যে ম্যাকমারা কাকার হত্যাকারী নন্ এটা আমি জানি। অযথা আমার বাবাকে ম্যাকমারা কাকার হত্যাকারী বলে সন্দেহ করা হয়েছে। মিঃ আলম, আমার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য এবং কাকার আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য যত অর্থের প্রয়োজন হয় আমি দেবো। আপনি ইচ্ছামত আমার বাড়ির যাবতীয় জিনিস ব্যবহার করতে পারেন। আপনাকে আমি দুটো শব্দবিহীন কার দিলাম, আপনি এগাড়ি দু'খানা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন।

বলেছিলো বনহুর— অশেষ ধন্যবাদ।

বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী আর্থার ঠিক পিতার মতই সদা হাস্যময় এবং আলাপী মানুষ। তেমনি সরল স্বাভাবিক স্বচ্ছপ্রাণ ছেলে। বনহুরের বড় ভাল লাগে আর্থারকে;

আর্থার শুধু বিশাল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারীই নয় তার চেহারা সুন্দর সুদর্শন, শিক্ষিত যুবক। বনহুর মনে মনে একটা আশা পোষণ করতো। আর্থার আর শ্যালনকে সে মনের আসনে একত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলো। শ্যালনের স্বজাতি এবং আত্মীয় আর্থার, তাছাড়া শ্যালনকে সে কামনা যে না করে তা নয়। কিন্তু আর্থার লাজুক ধরনের ছেলে, শ্যালনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার মত তার সাহসই হতো না।

বনহুর অবশ্য শ্যালনকে আর্থারের সাথে মিশবার সুযোগ দিয়ে অনেক সময় সরে থাকতো। একদিন প্রকাশ্য বলেছিলো বনহুর— আচ্ছা শ্যালন, আর্থারকে তোমার কেমন লাগে?

শ্যালন বনহুরের নাকটা আংগুল দিয়ে টেনে দিয়ে বলেছিলো— হঠাৎ এ প্রশ্ন কেনো আলম?

বলেছিলো বনহুর— আর্থারের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হলে কেমন হয় বলো তো?

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলো শ্যালন— অসম্ভব। আমি ওকে গ্রাহ্যই করিনে। কথাটা বলে চলে গিয়েছিলো শ্যালন সেখান থেকে।

বনহুর এরপর আর কোনো কথা বলা অবকাশ পায়নি।

বনহুর আজ যখন পার্ক সার্কাস বাসায় ফিরে এলো তখন পাঁচটা বেজে গেছে।

শ্যালন ঘর-বার করছিলো। মাঝে মাঝে দোতলায় বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলো জনমুখর রাজপথের দিকে। কত গাড়িই না এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে, কিন্তু তার আকাঙ্খিত গাড়িখানা কই। হঠাৎ শ্যালনের দৃষ্টি চলে যায়, অগণিত গাড়ির ভীড়ের ভিতর হতে বেরিয়ে আসে তার পরিচিত গাড়িখানা। যে গাড়ির জন্য সে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

বনহুরের গাড়ি এসে পৌঁছতেই শ্যালন ছুটে এসে দাঁড়ালো গাড়িখানার পাশে।

বনহুর নেমে দাঁড়াতেই ওর কণ্ঠ বেষ্ঠন করে অভিযোগের সুরে বললো শ্যালন— এতো বিলম্ব করলে কেন, বলো তো?

আর্থারও তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

বনহুর শ্যালনের এই স্বচ্ছ আচরণে একটু সঙ্কোচিত হলো। হেসে বললো— ভিতরে চলো সব বলছি।

বনহুর অগ্রসর হলো। আর্থারকে লক্ষ্য করে বললো— আসুন, কথা আছে।

আর্থার আর শ্যালন বনহুরকে অনুসরণ করলো।

খাবার টেবিলে এসে বসলো ওরা তিন জন।

শ্যালন খাবার পরিবেশন করছিলো।

আর্থার বললো—আমি খেয়েছি। কিন্তু শ্যালন এখনও অভুক্ত রয়েছে।

বনহুর নিজের খাবার মুখে দিতে গিয়ে হাতখানা আবার নামিয়ে নিলো, বিস্ময় ভরা দৃষ্টি তুলে ধরলো শ্যালনের মুখে, তারপর গম্ভীর গলায় বললো—এ কেমন কথা শ্যালন?

শ্যালন হেসে খাবার নিজের মুখে তুলে দিতে দিতে বললো— তুমিও তো অভুক্ত ছিলে-----

তাই এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবে শ্যালন?

আর্থার বললো—মিঃ আলম, সত্যি ওর কথা আপনি ভাবতে পারবেন না। আপনি চলে যাবার পর সে ঘরে খিল এঁটে বসে থাকবে, একদম বাইরে বের হবে না, বা কারো সঙ্গে কথা বলবে না।

কত করে অনুরোধ করলাম দরজা খুলে চারটি মুখে দিতে, কিন্তু কিছুতেই সে খাবে না.....

এ তোমার ভারী অন্যায় শ্যালন। বনহুর কঠিন গলায় বললো।

তুমি অমন ভাবে না খেয়ে চলে যাবে আর আমি বাড়ি বসে খাবো, না?

তাহলে কাল থেকে আমি রোজ না খেয়ে যাবো আর তুমিও উপোস করে মরো। থাক, আমি এখনও খাবো না। দেখি কতক্ষণ তুমি অভুক্ত থাকতে পারো।

আর্থার বললো—কাজ কি হবে আর এতোক্ষণে মান অভিমান করে। খান আপনি—শ্যালন, তুমিও খাও।

বনহুর খেতে লাগলো বটে কিন্তু শ্যালনের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বললো না!

বনহুর যেমন খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতে যাবে ঠিক সেই সময় কক্ষে প্রবেশ করলো এথোল। বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—আলম, তুমি নাকি আমার বাসায় গিয়েছিলে আমার সন্ধানে?

হাঁ। বললো বনহুর।

আর্থার এবং শ্যালনও উঠে দাঁড়িয়েছিলো।

বনহুর মিঃ এথোলকে আসন গ্রহণ করতে বলে নিজেও আসন গ্রহণ করলো।

বনহুর গম্ভীর মুখে সিগারেট ধরালো, তারপর সিগারেট কেসটা এথোলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—গ্রহণ করুন।

মিঃ এথোল সিগারেট-কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললেন....আলম, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। চলো নির্জনে যাই।

বনহুর এ রকম কোনো উক্তির অপেক্ষা করছিলো, বললো—চলুন। উঠে দাঁড়ালো বনহুর, শ্যালনের দিকে তাকিয়ে তাকে বারণ করলো তার সঙ্গে যেতে।

আর্থার বুঝতে পেরে সে যেমন বসে ছিলো তেমনি রইলো।

মিঃ এথোল আর বনহুর চলে গেলো বনহুরের শয়নকক্ষে। পাশা-পাশি দুটো সোফা অধিকার করে নিয়ে বসলো তারা। কক্ষ নির্জন। দরজা জানালায় মোটা ভেল্‌ভেটের নীল পর্দা ঝুলছে।

কক্ষমধ্যে বিরাজ করছে একটা স্নিগ্ধ-শীতল মিষ্টি পরিবেশ। একপাশে মূল্যবান একটি আধুনিক খাট, সে খাটে বনহুর শয়ন করে। পাশেই সেলফ, কয়েকখানা বই রয়েছে সেল্‌ফে। তাছাড়া মেঝেতে কয়েকটা সুন্দর আধুনিক সোফা, সোফার মাঝখানে একটি ছোট্ট টেবিল।

টেবিলে পা তুলে বসলেন মিঃ এথোল, তারপর একমুখ ধুয়া উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন তিনি—আলম, অযথা আমার পিছনে ঘোরার কি মানে হলো বলো? এই দুপুরে কাঠফাঁটা রোদটা শুধু কষ্ট করে কাটালে।

মিঃ এথোলের কথায় বনহুর অবাক হলো, তাহলে কি এথোল তাকে....

বনহুরকে ভাববার সময় না দিয়ে বললেন এথোল—আমি তোমার হাত এড়াবার জন্যই ভিক্টোরিয়া হলে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলাম!

বনহুরের মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হলো, পরক্ষণেই বললো সে—আপনার সঙ্গীটি কে ছিলেন তা জানবার জন্যই আমি আপনার গাড়িখানা ফলো করেছিলাম।

ওঃ এই কথা, তা তুমি পরে এক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেও পারতে? আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু আমার সঙ্গে ছিলো।

দেখুন, আপনি লুকোবার চেষ্টা করলেও আপনি আমার কাছে নিজের কার্যকলাপ গোপন রাখতে পারবেন না। মিঃ এথোল, আপনি যতই সচ্ছ হওয়ার চেষ্টা করুন না কেনো—কিন্তু আমি জানি আপনার সব কথা।

মুহূর্তে মিঃ এথোলের মুখ ফ্যাকাশে হলো। নিজেকে পোপন করার জন্য মুখটা অন্যদিকে ফেরালেন একবার।

বনহুর তীব্রকণ্ঠে বললো—আপনার সঙ্গীটি কে আপনি না বললেও আমি তাকে ঠিক চিনতে পেরেছি।

সত্যি বলছো আলম? এবার মিঃ এথোল খুশিতে যেন উচ্ছল হয়ে উঠলো।

বনহুর বিস্মিত হলো, অদ্ভুত মানুষ এই এথোল।

❑

ঐদিন রাতের কথা।

বনহুর শয্যায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছে। রাত তখন ঠিক চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। হঠাৎ টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে। বনহুর আশ্চর্য হলো, এতো রাতে কোথা হতে ফোন এলো—বিশেষ করে রাত চারটায়।

রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কানে ধরতেই ওদিক থেকে শোনা গেলো মিঃ এথোলের উত্তেজিত ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর—হ্যালো, হ্যালো—আলম....তুমি শীঘ্র....চলে....থেমে গেলো কণ্ঠ।

বনহুর বলে উঠলো—হ্যালো, আমি আলম বলছি.....বলুন.....হ্যালো বলুন....

ওদিক থেকে শোনা গেলো এথোলের আর্তকণ্ঠ—উঃ, আঃ....হ্যা....লো..বি...রিসিভার পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো।

বনহুর বার বার রিং করতে লাগলো—হ্যালো, হ্যালো...কিন্তু আর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না ওদিক থেকে। বনহুর এবার রিসিভার রেখে, দ্রুত হস্তে নাইট ড্রেস পাল্টে নিলো, তারপর ড্রয়ার খুলে বের করে নিলো রিভলভারখানা। হাত-ঘড়িটা এক নজর দেখে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসলো।

বনহুরের হাতে গাড়িটা উল্কা ছুটে চলেছে। পথ প্রায় জনশূন্য। গাড়ি চালাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তার। গাড়িখানা যে মিঃ এথোলের বাড়ি-মুখো চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলো গাড়িখানা।

বনহুরের বাড়ি মিঃ এথোলের বাড়ির সম্মুখ গেটে না লাগিয়ে পিছন বাড়িটার পাশে রেখে নেমে পড়লো সে। অতি দ্রুত পিছন বাড়ির প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো ভিতর বাড়িতে, তারপর কৌশলে পার হয়ে গেলো বনহুর এথোলের বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বাগানের মধ্যে। বনহুর এবার এথোলের শোবার কক্ষের পিছন পাইপ বেয়ে দ্রুত উঠতে লাগলো উপরের দিকে। মাত্র কয়েক মিনিট, বনহুর একে-বারে উঠে এলো উপর তলার পিছন রেলিং এর পাশে। এ সব তার অভ্যাস আছে, কোনো কষ্ট হলো না। রেলিং বেয়ে সোজা বনহুর চলে এলো দ্বিতলের সম্মুখ দরজায়। যেমন কক্ষে প্রবেশ করেছে, ঐ মুহূর্তে একটি লোক সাঁ করে চলে গেলো পিছনের শার্শী দিয়ে ওদিকে।

এক নজর দেখলেও বনহুর চিনতে পারলো, এ সেই লোক—যে আজ দ্বিপ্রহরে এথোলের গাড়িতে তার সঙ্গে ভ্রমণ করে ফিরেছে। বনহুর বিলম্ব না করে ঝুকে পড়লো শার্শী দিয়ে নীচের দিকে। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা গেলো না, পরক্ষণেই মোটর ষ্টার্টের শব্দ শোনা গেলো। বনহুর গাড়িখানাকে ফলো করবে, না এথোলের খোঁজ নেবে ভেবে নিলো। কিন্তু তার পূর্বেই দৃষ্টি চলে গেলো টেবিলের পাশে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো, পরক্ষণেই ছুটে এলো—চেয়ারে কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছেন মিঃ এথোল। বাম পাশের বুকে একখানা ছোরা সমূলে বিঁধে আছে। তাজা টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ছোরার পাশ দিয়ে। দক্ষিণ হাতখানা ঝুলছে, রিসিভারখানাও তার হাতের পাশে পড়ে রয়েছে। বনহুর বুঝতে পারলো—মিঃ এথোল মৃত্যুর পূর্বে তাকেই ফোন করেছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। হত্যাকারী তাঁর সব শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু কে এই হত্যাকারী, যে শুধু ম্যাকমারাকেই হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি—মিঃ এথোলকেও হত্যা করলো।

বনহুর ভাবলো এখন তার কি কর্তব্য। এখানে থাকা তার ঠিক হবে না। হঠাৎ বনহুরের নজর পড়লো—টেবিলে ওয়েট্চাপা একটা ভাঁজ করা কাগজে। তাড়াতাড়ি ওয়েট্ সরিয়ে ভাঁজ করা কাগজখানা হাতে তুলে নিয়ে লাইটের সামনে মেলে ধরলো। একটা ছোট্ট চিঠি, এবং চিঠিখানা এথোলকে লেখা হয়েছে। ওতে লিখা আছে পড়লো বনহুর রাতে আমি আসবো। তুমি তোমার ঘরে প্রতিক্ষা করো। বিশেষ কথা আছে তোমার সঙ্গে!

—হিতৈষী বন্ধু

বনহুর চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো, ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে শোনা গেলো ভারী বুটের শব্দ। বনহুর বিলম্ব না করে যে পথে সেই হিতৈষী বন্ধু অন্তর্ধান হয়েছিলো, ঐ পথে সেও অদৃশ্য হয়।

পিছন পাইপ বেয়ে অতি অল্প সময়ে বনহুর নেমে আসে নীচে। তারপর নিজের গাড়িখানার পাশে গিয়ে হাজির হয়। বনহুর যখন গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো তখন এথোলের কক্ষের জানালা দিয়ে নীচের দিকে রাইফেলের গুলীর শব্দ শোনা যেতে লাগলো। হয়তো পুলিশ এসে গেছে এবং এথোলের হত্যাকারীর সন্ধানে পর পর গুলী ছুঁড়ে খোঁজ করছে। কিন্তু আশ্চর্য, পুলিশ এতো দ্রুত কি করে এ খুনের সন্ধান পেলো!

বনহুরের গাড়ি তখন সোজা পার্ক সার্কাস অভিমুখে ছুটতে শুরু করেছে।

জন-বিহীন পথ বেয়ে বাড়িখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্ক সার্কাসে মিঃ আলবার্ডের বাড়ির বাড়ি-বারান্দায় এসে পৌঁছলো। গাড়ি থেকে নেমে নিজের

কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর, কিন্তু শয্যা গ্রহণ করতে পারলো না। কক্ষমধ্যে পায়চারী করে ফিরতে লাগলো মনে তার নানা চিন্তা উদয় হচ্ছে। যে ব্যক্তি ম্যাকমারাকে হত্যা করেছে, সে-ই হত্যা করেছে মিঃ এথোলকে। কিন্তু এথোলকে হত্যা কেন করা হলো! ম্যাকমারার নিকটে এমন কোনো জিনিস ছিলো, যার লোভে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে! এথোলের কাছে তো সে জিনিস ছিলো না, তবু তাকে হত্যা করা হলো। এথোলের নিহত হবার একমাত্র কারণ, ম্যাকমারা হত্যা-রহস্য তিনি জানতেন। এ হত্যা-রহস্য যাতে উদঘাটন না হতে পারে, সে কারণেই ম্যাকমারার হত্যাকারী হত্যা করলো মিঃ এথোলকে। আজ দ্বিপ্রহরে যে ব্যক্তি এথোলের সঙ্গে ঘুরে ফিরেছে সেই খুনী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে? বনহুর তাকে দেখেছে বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। দ্বিপ্রহরে যে ব্যক্তিকে এথোলের সঙ্গে দেখেছিলো, কিছু পূর্বে তাকেই বনহুর দেখেছে এথোলের কক্ষ হতে পিছন শার্শী দিয়ে পালাতে। লোকটার দেহে দ্বিপ্রহরের সেই ড্রেসটাই পরিহিত রয়েছে। স্যুট-প্যান্ট-টাই এবং মাথায় একটি ক্যাপ, ক্যাপটি দিয়ে তার মুখের প্রায় অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করে কে এই ব্যক্তি এবং কেন সে পর পর হত্যা করে চলেছে। ম্যাকমারার সেই ছোট্ট ময়লা জামাটার মধ্যে কি ছিলো, যা জানতে পেরেছিলো তাঁর হত্যাকারী....

বনহুর নিজে দস্যু, অথচ এভাকে তাকে গোয়েন্দার কাজে নিয়োজিত হতে হবে ভাবতে পারেনি! অবশ্য তাকে এর পূর্বেও কয়েকবার কয়েকটি হত্যা-রহস্য উদঘাটন করতে হয়েছিলো।

হঠাৎ বনহুরের চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ে। টেবিলে ফোনটা বেজে উঠে সশব্দে। বনহুর চট্ করে রিসিভার হাতে উঠিয়ে নেয় না, ফোনটা অবিরত ক্রিং ক্রিং শব্দ করে চলেছে।

বনহুর পাশের চেয়ারে বসে ধীরে-সুস্থে রিসিভার হাতে উঠিয়ে নিয়ে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠের অনুকরণে বললো—হ্যালো, আমি আলম বলছি....কি বললেন, খুন....কোথায়? মিঃ এথোল খুন হয়েছেন—বলেন কি!

বনহুরের ঠোঁটে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

ব্যস্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো শ্যালন-আলম, কে খুন হয়েছে? কে খুন হয়েছে?

রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে শ্যালনকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—মিঃ এথোল খুন হয়েছেন....

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো শ্যালন—এথোল কাকা খুন হয়েছেন!

হাঁ! রিসিভার রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বনহুর—শুধু এথোল কাকাই নয়, এমনি আরও কতজন যে নিহত হবেন তার সঠিক হিসাব বলা কঠিন।

শ্যালনের মুখ ছাই-এর মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কম্পিত গলায় বলে-কে তাঁকে খুন করেছে?

কেমন করে বলবো, বলো?

আলম, এই মুহূর্তে কে তোমাকে ফোন করেছিলো? কে তোমাকে জানালো এথোল কাকা খুন হয়েছে?

পুলিশ সুপার মিঃ বিনয় সেন। গম্ভীর গলায় বললো বনহুর। এবার সে বাইরে বের হবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালো—শ্যালন, আমি যাচ্ছি।

কোথায় যাবে?

পরে বলবো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। কিন্তু গাড়িতে উঠতে যাবে, পিছনে শ্যালন এসে দাঁড়ালো। অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর—শ্যালন, তুমি কেন এলে?

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

অসম্ভব।

আমি যাবো।

দেখো, ছেলেমির একটা সীমা আছে।

বেশ, আমাকে না নিলে। যাও, কিন্তু তোমার আসল জিনিস কই?

পকেটে হাত দিয়ে মনে পড়লো রিভলভারের কথা। শ্যালন বললো—যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বনহুর দ্রুত চলে গেলো রিভলভারখানা আনতে।

শ্যালন ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ির পিছনে খোলসের মধ্যে প্রবেশ করে চুপটি মেরে বসে রইলো।

বনহুর মনে করলো শ্যালন ফিরে গেছে তার কক্ষে। তবু গাড়ির ভিতরটা একবার ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখে নিলো।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েই হাতঘড়িটা দেখে নিলো বনহুর। ভোর ছয়টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকী!

বনহুরের গাড়ি ছুটে চলেছে।

পার্ক সার্কাস রোড ত্যাগ করে কড়েয়া রোড় হয়ে ভবানীপুর অভিমুখে চললো।

ভোরের হাওয়া তখন বইতে শুরু করেছে!

ধ্রুবতারা অন্তর্ধান হয়েছে অনেকক্ষণ।

বনহুরের গাড়ি এসে থামলো ভবানীপুর একটা হোটেলের সম্মুখে।

এ হোটেলেই ম্যাকমারার বিশ্বস্ত ছাত্রগণ বাস করছে। ম্যাকমারা নিহত হবার পর তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ম্যাকমারার জাহাজ এখনও খিদিরপুর ডকে অপেক্ষা করছে।

বনহুর গাড়ি রেখে হোটলে প্রবেশ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় একটি কামরার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। কক্ষের দরজায় টোকা দিয়ে শব্দ করলো সে।

এখনও হোটেলের অভ্যন্তর লোকজনের কলকণ্ঠে সরগরম হয়ে ওঠেনি। দু'চার জন হোটেলবাসী বিদেশী ভদ্রলোক কেবল-মাত্র শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করতে বাথরুমে প্রবেশ করেছেন। কেউ বা এসে দাঁড়িয়েছেন রেলিং এর পাশে। ভোরের হাওয়া উপভোগ করছেন হয়তো।

ম্যাকমারার ছাত্রগণ প্রফেসারের আকস্মিক মৃত্যুতে একেবারে ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়েছে। যে রাতে ম্যাকমারা নিহত হন সে রাতে তারাও ছিলো আলবার্ডের বাড়িতে। আলম সাহেবের সঙ্গেই হলঘরের পাশের কামরায় ঘুমিয়ে ছিলো। ম্যাকমারা নিহত হবার পর তারা আর সে বাড়িতে থাকতে রাজি হয়নি। ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলো ছাত্রদল।

বনহুর অনেক বলে-কয়েও যখন তাদের আর সে বাড়িতে রাখতে পারলোনা তখন আর্থারের সাহায্যে ভবানীপুর এ হোটেলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। এখানে ওদের যেন কোনো কষ্ট না হয় সেজন্য মাঝে মাঝে বনহুর নিজে এসে তাদের দেখাশোনা করতো।

ছাত্রদের মধ্যে ম্যাকমারার প্রধান ছাত্র হুইসন স্মিথ ছিলো সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। বনহুরের খুব ভাল লাগতো এই যুবকটিকে। আফ্রিকার জঙ্গলে বনহুর ওকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করতো। তারপর জাহাজে যখন শ্যালন থাকতো না তার পাশে, তখন হুইসন ছিলো তার সাথী। হুইসন স্মিথের সঙ্গে বনহুরের অনেক কথা চলতো, আজও তার সঙ্গে দেখা করে গোপন কোনো কথা আলোচনা আশায় সে এই রাত ভোরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বনহুর বার কয়েক দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একজন ছাত্র, সম্মুখে আলমকে দেখে বললো সে—কি ব্যাপার? আপনি?

হাঁ, হুইসনের সঙ্গে জরুরী কথা আছে, সে কি উঠেনি?

ছাত্রটি যেন অবাক হলো, সে বললো—হুইসন তো রাতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পার্ক সার্কাস গিয়েছিলো।

পার্ক সার্কাস! আমার সঙ্গে দেখা করতে?

হাঁ, কিন্তু সে ফিরে আসেনি।

বনহুর চমকে উঠলো যেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—হুইসন রাতে ফিরে আসেনি!

না!

বনহুর কিছুক্ষণ মৌন থেকে কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করলো। তারপর বললো—আচ্ছা চলি।

ছাত্রটি বললো—সে ফিরে এলে তাকে কিছু বলবো কি?

বলতে হবে না, আমি সময় হলে আবার আসবো। ক[illegible] করে বনহুর দ্রুত সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায়।

কিন্তু হোটেলের সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই বিস্মিত হলো। তার গাড়িখানা কোথায় উধাও হয়েছে। এদিক-সেদিন ব্যস্তভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। আশেপাশে কয়েকখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—শুধু তার গাড়িখানাই নেই। বনহুর নিজের ভুল বুঝতে পারলো, গাড়ির চাবি সে সঙ্গে না নিয়েই গাড়ি থেকে নেমে চলে গিয়েছিলো হোটেলের মধ্যে। বনহুর যখন ভাবছে ঠিক সেই মুহূর্তে তার পাশে গাড়ি এসে থামলো।

ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলো বনহুর—এযে তারই গাড়ি! আরও অবাক হলো গাড়ির ড্রাইভিং সিটে লক্ষ্য করে—শ্যালন বসে আছে! বনহুর গম্ভীর রাগত কণ্ঠে বললো—একি!

দেখো রাগ করোনা লক্ষ্মীটি! তুমি আমাকে নিয়ে না এলেও আমি তোমার সঙ্গে ছায়ার মত রয়েছি।

তা দেখতেই পাচ্ছি। বললো বনহুর।

গাড়িতে উঠে এসো কথা আছে। শ্যালন একটু ব্যস্তভাবেই কথাটা বলে ড্রাইভিং আসন ত্যাগ করে সরে বসলো।

বনহুর বললো—কি করে এলে? আর গিয়েছিলেই বা কোথায়?

শ্যালন পিছন দিকে তাকিয়ে বললো—এসেছি ছামার বক্সে।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরোনি?

না, ফাঁক ছিলো।

এতো ব্যস্ততার মধ্যেও বনহুরের হাসি পেলো। ড্রাইভিং আসনে চেপে বসে বললো—গাড়ি নিয়ে কোথায় উধাও হয়েছিলে?

শ্যালন বাড়ির আশেপাশে সর্তক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিয়ে বললো—জানো, তুমি যখন চলে গেলে তখন একটা লোক তোমার গাড়ির পাশে এসে উঁকিঝুঁকি মেরে কি একটা জিনিস পিছনের আসনের নীচে রেখে গেছে।

বনহুর অবাক হয়ে বললো—দেখোনি কি জিনিস?

না, দেখবো কি করে—লোকটা গাড়িতে জিনিসটা রেখে দ্রুত অন্য একটা গাড়িতে চেপে পালাতে গেলো।

তারপর?

আমি আমাদের গাড়ির ছামার বক্সে বসে উঁকি দিয়ে সব দেখছিলাম। লোকটা যেমন ওর গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছিলো, অমনি আমি ছামার বক্স থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়ি নিয়ে লোকটার গাড়িকে ফলো করলাম। সে গাড়িতে কি রেখে গেলো দেখবো কখন? তাছাড়া লোকটা এমন চোরের মত চুপি চুপি কাজ করলো—তাতে মনে হলো, সে নিশ্চয়ই কোনো ভাল জিনিস রাখেনি... ...

এ সন্দেহ মনে হওয়ার পরও তুমি জিনিসটা না দেখে গাড়িখানাকে ফলো করলে?

হাঁ।

শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়েছো?

হয়েছি, চলো আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু তার পূর্বে সে কি জিনিস আমার গাড়ির পিছন আসনের তলায় লুকিয়ে রেখেছে দেখতে হয়। বনহুর গাড়ি থেকে নেমে পিছন আসনের দরজা খুলে ফেললো। সীটের তলায় লক্ষ্য করে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—এযে ডিটোনেটার!

শ্যালন ঝুকে পড়ে বললো—সেটা কি?

এক ধরনের টাইম বোম্। কিন্তু কি আশ্চর্য, এতোক্ষণ বলো নি?

ওটা কেন রেখে গেলো? গাড়িখানাকে ধ্বংস করার জন্য বুঝি?

শুধু গাড়িখানাকেই ধ্বংস করা উদ্দেশ্য নয় গাড়ির চালককেও।

উঃ কি সাংঘাতিক!

শ্যালন, আর মুহূর্ত বিলম্ব করা ঠিক নয়, চলো আগে এটার সৎগতি করে আসি।

কোথায় যাবে?

বনহুর ড্রাইভিং আসনে চেপে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

শ্যালন বসেছে তার পাশের আসনে।

ডিটোনেটারটা তখন পিঁছনের আসনের তলায় পড়ে রয়েছে।

বনহুরের গাড়ি স্পীডে ছুটে চলেছে।

পথঘাটে সবেমাত্র যানবাহন চলাচলের ব্যস্ততা বেড়ে উঠেছে। বনহুর ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলো, সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো—শ্যালন, এ মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু ঘটতে পারে। জানিনা বোম্টার টাইম শেষ হয়ে এসেছে কি না।

কি সর্বনাশ, আমি যদি ওটাকে আগেই দূরে ফেলে দিতাম....

না দিয়ে খুব ভালই করেছো শ্যালন। ওটা ফেলতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে।

তবে তুমি ওটাকে ফেলে দাও না গাড়ির বাইরে?

কি ভয়ঙ্কর কথা বলছো শ্যালন। জানোনা বোম্‌টা কত বড় সাংঘাতিক। পথের ধারে ফেলবো—পাথের লোকের মৃত্যু ঘটবে যে!

তাহলে কি করবে?

যদি বোম্‌টাকে শেষ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারি, তবে একেবারে গঙ্গার জলে।

❑

অদৃষ্ট ভাল বলতে হবে বোম্‌টা নিয়ে বনহুরের গাড়ি গঙ্গা-তীরে এসে পৌঁছলো। এর মধ্যে বোম্ শান্ত হয়েই রইলো। বনহুর বললো—শ্যালন, তুমি দূরে সরে যাও। যদি মরতে হয় একাই মরবো।

আর আমি বেঁচে থাকবো? তা হবে না।

আঃ বিরক্ত করো না শ্যালন, বলছি সরে যাও। সরে যাও।

শ্যালন সরে যেতে বাধ্য হলো।

বনহুর এবার দ্রুত গাড়ির দরজা খুলে ডিটোনেটার বোম্‌টা আস্তে করে হাতে তুলে নিলো, তারপর গঙ্গার অথৈ পানিতে ঝপ করে ফেলে দিলো।

শ্যালন তখনও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুরে।

বনহুর লক্ষ্য করলো—বোম্‌টি গঙ্গার অথৈ পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হলো। বনহুর বুঝতে পারলো—বোম্‌টির টাইম শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কি সর্বনাশ! আর এক সেকেণ্ড হলেই তার মৃত্যু ঘটতো তাতে কোনো ভুল নেই।

ভাগ্যিস, আশেপাশে কোনো জনমানব ছিলোনা! গঙ্গার তীর নীরব নিস্তব্ধ, দূরে কয়েকখানা বড় নৌকা বাঁধা রয়েছে। নৌকার যাত্রিগণ এখন হয়তো ঘুমে অচেতন। পূর্ব আকাশ রাঙা করে উঁকি দিয়েছে ভোরের সূর্য।

ফিরে দাঁড়ালো বনহুর।

শ্যালন কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর শ্যালনের দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো—শ্যালন, আজ তুমিই আমাকে সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে। আমি বুঝতেও পারতাম না, আমার গাড়ির পিছন আসনের তলায় কেউ ডিটোনেটার বোম্ রেখে গেছে। উঃ কি সাংঘাতিকভাবে বেঁচে গেলাম আজ!

দেখলে তো আমাকে তুমি সঙ্গেই আনতে চাইছিলে না।

সত্যি আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ শ্যালন।

আর আমাকে তুমি আফ্রিকার জঙ্গলে কত বার গরিলার কবল থেকে বাঁচিয়েছো। সব আমার মনে আছে, থাকবে চিরকাল।

শ্যালন, দেখ ভোরের সূর্য আমাদের দু'জনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

শ্যালন হেসে বললো—এবার হতে আমাকে সঙ্গে নেবে তো?

নেবো।

চলো।

কিন্তু জানো আমার এক মুহূর্ত এখন বিশ্রামের অবকাশ নেই শুধু তোমার পিতার হত্যা-রহস্যই নয়, আরও অনেক রহস্য এখন জট পাকিয়ে উঠেছে—সব রহস্য উদঘাটন করতে হবে।

তুমি কি গোয়েন্দা?

যদি বলো তাই।

তোমার দুঃসাহস দেখলে আমার আর একটি কথা মনে হয়।

বলো?

তুমি ডাকাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

তার চেয়েও!

তুমি দস্যু।

মনে করো তাই।

হেসে উঠে শ্যালন—রাগ করলে?

মোটেই না। চলো! গাড়ির দিকে অগ্রসর হলো বনহুর, তখনও শ্যালনের হাতখানা তার হাতের মুঠায়।

গাড়িতে বসে বললো বনহুর—আমার কাজ আছে, তোমাকে রেখে আসি কেমন?

সঙ্গে নিতে যখন এতো আপত্তি তখন বেশ তাই চলো।

শ্যালনকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে সোজা বনহুর হাজির হলো লালবাজার পুলিস অফিসে। পৌঁছতেই থানার ও সি সসম্মানে অফিসের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন বনহুরকে।

ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ অফিসে ছিলেন না। একটু পরে ফিরে এলেন। তিনি মিঃ এথোলের হত্যা ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এইমাত্র বৌবাজার থেকে তিনি ফিরছেন!

রাজেন্দ্রনাথ অফিসে প্রবেশ করে বনহুরকে হ্যাণ্ডসেক করলেন-হ্যালো মিঃ আলম, ভাল তো?

বললো বনহুর-কই আর ভাল বলুন। পর পর একি হত্যাকাণ্ড শুরু হলো বলুনতো! আজ আবার একটা খুন।

রাজেন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করে মাথার সরকারী ক্যাপটা খুলে টেবিলে রেখে বললেন—এথোলের লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তবে এলাম। সত্যি, এসব কি রকম হত্যাকাণ্ড শুরু হলো! আমাদের পুলিশ মহল বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

কোন রকম ক্লু পেলেন?

তেমন কিছু পাইনি। তবে হত্যাটা ঠিক মিঃ ম্যাকমারা হত্যার অনুকরণেই হয়েছে। তাঁর মতই এর বুকেও ছোরা বসানো। মিঃ ম্যাকমারার দক্ষিণ হস্তখানা যেমন টেলিফোনে সংলগ্ন ছিলো তেমনি মিঃ এথোলও কারো কাছে ফোনের আলাপ করছিলেন সেই মুহূর্তে তিনি নিহত হয়েছেন।

বনহুর বুঝতে পারলো মিঃ এথোল হত্যা হবার পূর্ব মূহূর্তে তার কাছেই ফোন করেছিলেন, কিন্তু বনহুর সম্পূর্ণভাবে সে কথা চেপে গেলো। অবাক হবার ভান করে বললো—আশ্চর্য!

বললেন রাজেন্দ্রনাথ—শুধু আশ্চর্যই নয় মিঃ আলম, একেবারে যেন বিস্ময়কর ব্যাপার। লাশগুলো পরীক্ষা করে এমন মনে হয়েছে, যেন কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় তারা খুন হয়েছেন। এতটুকু ধস্তাধস্তি বা নড়াচড়া করবার সুযোগ তারা পাননি।

বনহুর হঠাৎ বলে উঠলো—অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড ইন্সপেক্টার।

অদ্ভুতই বটে। দুটো মহৎ প্রাণ কোনো হিংস্র শয়তানের কঠিন হস্তে নিঃশেষ হয়ে গেলো।

আরও কটা হবে কে জানে। বললো বনহুর।

রাজেন্দ্রনাথ দাঁতে দাঁত পিষে বললো—তৃতীয় হত্যা হবার পূর্বেই হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। মিঃ আলম, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারেন।

বলুন আমি আপনাদের কি কাজে আসতে পারি?

আমার বিশ্বাস, আপনি নিজেও এব্যাপারে আগ্রহশীল। অবশ্য কারণ আছে—আপনার ভাবী শ্বশুর নৃশংস ভাবে প্রাণ হারালেন ---থামলেন রাজেন্দ্রনাথ।

বনহুর বললো—আপনি ঠিক বলেছেন ইন্সপেক্টার। এ হত্যা রহস্য আমাকেও বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

রাজেন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করলেন বনহুরের সঙ্গে—আপনি আমাদের সহায়তা করবেন নিশ্চয়ই?

করবো। গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর।

এবার বনহুর মিঃ এথোলের হত্যা-রহস্য নিয়ে গভীরভাবে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলো মিঃ রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

কথাবার্তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ ফোনটা সশব্দে বেজে উঠলো ও সি ফোন ধরলেন—পরক্ষণেই রিসিভারের মুখে হাত রেখে বললেন—স্যার, আপনার ফোন।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ ফোন ধরলেন এবার—হ্যালো, আজ্ঞে হাঁ এই মাত্র - ফিরে এসেছি--হাঁ লাশ মর্গে পাঠিয়ে দিয়েই এসেছি---আজ্ঞে না তার ঘরে কেনো রকম ধস্তাধস্তির চিহ্ন পর্যন্ত ছিলো না। আচ্ছা স্যার, আসছি—সাক্ষাতে সব বলবো, হাঁ---এখানে মিঃ আলম আছেন। তাকেও আনবো? আচ্ছা স্যার, মিঃ আলমকে জিজ্ঞেস করে নিই তিনি এখন আমার সঙ্গে আসতে পারবেন কিনা। রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন ইন্সপেক্টার মিঃ রাজেন্দ্রনাথ—কমিশনার স্বয়ং ফোন করেছেন। আপনাকে আমার সঙ্গে তার ওখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

বনহুর বললো—বেশ, যাবো চলুন।

রাজেন্দ্রনাথ পুনরায় ফোনে মুখ রেখে বললেন—স্যার, মিঃ আলম আমার সঙ্গে আসছেন। রিসিভার রেখে চেয়ারে ঠেশ দিয়ে বসলেন রাজেন্দ্রনাথ—রাত থেকে এতটুকু বিশ্রাম নেই।

থানা অফিসার দেবনারায়ণ বললেন—স্যার, চা লাগবে?

হাঁ, আনতে বলুন। দেখি শরীরটা একটু চাঙ্গা করে নিই।

অল্পক্ষণে চা এলো।

চা পান শেষ করে ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ এবং বনহুর গাড়িতে চেপে বসলো। বনহুর অবশ্য নিজের গাড়িতেই চললো।

ডালহৌসী স্কোয়ার সেক্রেটারী-এটের অদূরে কমিশনার বিনয় সেন গুপ্তের বিরাট হোয়াইট ওয়াশ্ করা বাড়ি। লোহার ফটকে রাইফেলধারী পুলিশ দণ্ডায়মান। লাল কাঁকড় বিছানো পথ চলে গেছে গাড়ি-বারান্দায়। গাড়ি-বারান্দার দু'পাশে দু'জন রাইফেল ধারী পাহারাদার সদাসর্বদা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ রাজেন্দ্রনাথের গাড়ি এবং মিঃ আলমের গাড়ি—পর পর দুখানা গাড়ি লৌহ ফটক পার হয়ে প্রবেশ করলো ভিতরে। রাইফেলধারী পাহারাদারগণ সেলুট করে সরে দাঁড়ালো।

কমিশনারের বাসা-সংলগ্ন অফিসঘর।

বিনয় সেন অফিস ঘরেই ছিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করছিলেন, চোখে মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। অদূরে একখানা চেয়ারে পুলিশ সুপার বসে কাগজপত্র দেখছেন।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ এবং মিঃ আলমবেশী দস্যু বনহুর প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেই মিলিটারী কায়দায় সেলুট্ করলেন মিঃ সেন এবং মিঃ বোসকে।

বনহুর বললো—গুড্ মর্নিং।

বিনয় সেন অস্ফুট একটু শব্দ করলেন—গুড্ মর্নিং। বসুন আপনারা। কথাটা বলে নিজেও আসন গ্রহণ করলেন কমিশনার।

পুলিশ সুপার শ্রী সমর বোস একবার মাত্র চোখ তুলে দেখে নিয়ে পুনরায় নিজের কাজে মনোযোগ দিলেন।

বিনয় সেন বললেন—আমি আশ্চর্য হয়েছি—পর পর একইভাবে দুটি খুন সংঘটিত হলো।

স্যার, মিঃ এথোলের খুন আর ম্যাকমারার হত্যা ঠিক্ একই ভাবে ঘটেছে। ম্যাকমারাও যেমন ফোন করছিলেন তাঁর বন্ধুর কাছে, তেমনি মিঃ এথোলও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কারো নিকটে ফোন করছিলেন, কারণ মিঃ এথোলের হাতের পাশেই পড়ে ছিলো রিসিভারখানা।

হাঁ, আপনি ফোনে আমাকে সেরূপ বলেছেন।

বনহুর শান্ত কণ্ঠে বললো—স্যার, আপনি আমাকে যখন ফোন করে মিঃ এথোলের মৃত্যু-সংবাদ জানালেন, তখন আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আপনি না হয়ে যদি অন্যকেহ আমাকে এ সংবাদ জানাতেন তাহলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না।

বিনয় সেন গম্ভীর গলায় বললেন—আমি ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথের ফোন পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধু ম্যাকমারা হত্যার পর মিঃ এথোলের নিহত সংবাদ আমাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে ফেলেছে। আমি রাজেন্দ্রনাথের ফোন পেয়েই আপনার কাছে ফোন করেছিলাম।

পুলিশ সুপার এবার কাগজপত্র সরিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। তিনি বললেন—ইন্সপেক্টার মিঃ এথোলের নিহত সংবাদ আপনি কখন কোন্ সময় পেয়েছিলেন?

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ বললেন—কাল একটা ডাকাতি কেস নিয়ে আমাকে পুলিশ অফিসে রাত চারটা অবধি কাজ করতে হয়েছিলো। কাজ শেষ করে যখন বাসায় ফিরবো—ঐ মুহূর্তে বৌবাজার মিঃ এথোলের বাড়ি থেকে তার বৃদ্ধ বয় ফোন করেছে—তার মনিব নিহত হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে তবে বৌবাজার রওয়ানা দিই।

পুলিশ সুপার মিঃ বোস পুনরায় প্রশ্ন করলেন—আপনি যখন থানা অফিসার এবং পুলিশসহ মিঃ এথোলের বাড়িতে পৌঁছলেন তখন রাত কয়টা আন্দাজ ছিলো?

স্যার, রাত তখন কত হবে আমার ঠিক্ মনে নেই কারণ মিঃ এথোলের মৃত্যু-সংবাদ আমাকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছিলো।

পরপর পুলিশ সুপার মিঃ বোস ইন্সপেক্টার মিঃ রাজেন্দ্রনাথকে মিঃ এথোল হত্যা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করে চললেন।

বিনয় সেন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে যেতে লাগলেন। মিঃ ম্যাকমারা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ছিলেন। মিঃ এথোলের সঙ্গেও তাঁর গভীর একটা বন্ধু ভাব ছিলো। বিনয় সেন পর পর এদের দু'জনার হত্যাকাণ্ডে একেবারে মুষড়ে পড়েছেন।

মিঃ এথোল হত্যা ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলার পর মিঃ বিনয় সেন বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন—মিঃ আলম, আপনি আমার বন্ধু ম্যাকমারার ভাবী জামাতা। আমার পুত্র স্থানীয় আপনি। একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো বলে আজ আপনাকে আমি ডেকেছি।

করুন স্যার?

আচ্ছা মিঃ আলম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন—ম্যাকমারা আর এথোলের মধ্যে গভীর ভাব ছিলো?

শুধু আমি নই, আপনি নিজেও জানেন তাদের সম্বন্ধ কেমন ছিলো।

আমি জানি, তবু আপনাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা মিঃ আলম আপনি আজ বেশ কয়েকদিন হলো মিঃ আলবার্ডের বাড়িতে আছেন। ও বাড়ির অনেক ব্যাপারই আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। বলুন তো আলবার্ড পুত্র আর্থার কেমন ধরণের ছেলে? অবশ্য একজন সম্বন্ধে এ রকম প্রশ্ন করা যদিও ঠিক্ নয় তবু করতে বাধ্য হচ্ছি।

স্যার, আলবার্ড সম্বন্ধে আমি সম্পুর্ণ অজ্ঞ হলেও আর্থার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত সচেতন। আর্থার এ যুগের ছেলে হয়েও সে অতি সহজ-সরল-স্বাভাবিক থাকে বলে সৎ চরিত্র।

বিনয় সেন পুলিশ সুপার মিঃ বোসের দিকে তাকিয়ে বললেন—

দেখুন আমি যা বলেছিলাম সত্যি কিনা। আমারও ঐরূপ ধারণা আর্থার সম্পূর্ণ এ ব্যাপারে নির্দোষ।

মিঃ বোস বললেন—কিন্তু পুলিশ রির্পোটে তাকেও সন্দেহ করা হয়েছে।

ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ বললেন—মিঃ ম্যাকমারা হত্যা ব্যাপারে মিঃ এথোল মিঃ আলবার্ডকে হত্যাকারী বলে প্রমাণ করেছিলেন। এটাও এথোলের নিহত হবার কারণ হতে পারে। পিতাকে হত্যাকারী প্রমাণিত করার অপরাধে সৎচরিত্র আর্থারও নৃশংস হয়ে উঠতে পারে।

আপনারা কি বলতে চান আর্থার মিঃ এথোলের হত্যাকারী? বললো বনহুর।

বিনয় সেন বললেন আবার—হাঁ, তাকে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। এবং সে কারণেই আপনাকে আমি আমার এখানে আসার অনুরোধ জানিয়েছি। আমরা জানতে চাই—মিঃ এথোল যখন খুন হলেন তখন আর্থার কোথায় ছিলো— তার বাসভবনে না বাইরে?

স্যার, যদিও আমি সত্যি কথা বলছি, তবুও শপথ করে বলছি—আর্থার তখন বাড়িতে ছিলো।

বিনয় সেন গম্ভীর মুখে বললেন—হুঁ!

মিঃ বোস বললেন—কি করা যাবে স্যার? আর্থার কি---

হাঁ, সে মুক্তই থাক কিন্তু তার গতিবিধি লক্ষ্য রেখে চলতে হবে। মিঃ আলম?

বলুন স্যার?

আপনি এ হত্যা ব্যাপারে পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করলে আমি অত্যন্ত খুশী হবো। এবং আপনাকে--

থাক্ আপনি খুশী হলেই আমি কৃতার্থ হবো মিঃ সেন।

কথা ক'টি বলে উঠে দাঁড়ালো বনহুর—আমি এবার যেতে পারি?

ইয়েস। কিন্তু আপনি আমার কথা মনে রাখবেন মিঃ আলম। এ হত্যা ব্যাপারে আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন এবং পারবেন।

আমি কথা দিয়েছি স্যার করবো।

বনহুর বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে। যাবার সময় প্রথমে বিনয় সেন, পরে মিঃ বোস এবং মিঃ রাজেন্দ্রনাথের হ্যাণ্ডসেক্ করে বিদায় গ্রহণ করলো।

পুলিশ সুপার বললেন এবার—স্যার, আমার মনে হয় মিঃ আলবার্ডের পুত্র মিঃ আর্থার এই হত্যা ব্যাপারে জড়িত আছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার সুপারের কথায় যোগ দিয়ে বললেন—আমারও সেই রকম সন্দেহ হয়। আর্থার সম্বন্ধে মিঃ আলম যতই প্রশংসা করুন, আর্থার পিতার ব্যাপারে ক্রোধান্ধ হয়ে মিঃ এথোলকে হত্যা করা অসম্ভব নয়।

মিঃ বিনয় সেন স্থির কণ্ঠে বললেন—গভীরভাবে সন্ধান না নেয়া পর্যন্ত কাউকে দোষারূপ করা যায় না। আপনারা মিঃ এথোল হত্যা-রহস্য উদ্‌ঘাটনে যথার্থভাবে মনোযোগী হন। শুধু তাই নয়, মিঃ ম্যাকমারার হত্যা—রহস্যও উদ্‌ঘাটন করার জন্য আমাদের পুলিশ বিভাগকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি। অচিরেই এ দুটি হত্যাকাণ্ডের গুপ্ত রহস্য ভেদ করা চাই। কে এদের হত্যাকারী? কি তার উদ্দেশ্য?

মিঃ বোস বললেন—ম্যাকমারা হত্যা-ব্যাপার নিয়ে পুলিশ মহল অত্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে স্যার। কিন্তু এখনও হত্যাকারী সম্বন্ধে কোনো রকম 'ক্লু' আবিস্কার হলো না। আবার আর একটি খুন।

হাঁ আবার খুন! কিন্তু কেন এ খুন হচ্ছে বা কে করছে—তাকে খুঁজে বের করতে হবে। মিঃ বোস, আপনি সি, আই, ডি, বিভাগকে জানিয়েছেন, যে এ হত্যাকারীর সন্ধান দিতে পারবে তাকে চূড়ান্তভাবে পুরুস্কৃত করা হবে।

তখনকার মত সবাই উঠে পড়লেন। কথাবার্তা এখন এ পর্যন্ত রইলো। বিদায় গ্রহণ করলেন পুলিশ সুপার মিঃ বোস এবং ইন্সপেক্টার মিঃ রাজেন্দ্র নাথ।

❑

বনহুর বিছানায় শুয়ে সিগারেট থেকে ধূম্ররাশি নির্গত করে চলেছিলো, গভীর চিন্তায় তার মন আজ আচ্ছন্ন। বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখতে না রাখতে এক হত্যা-রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো সে। এ হত্যা-রহস্য তাকে শুধু উন্মত্তই করে তোলে নি তার মনে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ম্যাকমারার জামার মধ্যে কি লুকানো ছিলো? যার জন্য ম্যাকমারা প্রাণ হারালো, নিহত হলেন এথোল। পরপর দুটো হত্যার পিছনে যে ম্যাকমারার জামা তাতে কোন সন্দেহ নেই। বনহুর সিগারেট থেকে শেষ বারের মত ধূম্ররাশি নির্গত করে সিগারেটটা ফেলে দিলো পাশের ছাইদানীতে। হঠাৎ একটা শব্দ হলো ঘটাং করে। বনহুর চমকে উঠলোনা, মনে করলো শ্যালন বুঝি দরজা খুলে তার কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হলো—তার কক্ষের দরজা খুলে গেছে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকমারার ছাত্র হুইসন স্মিথ। যার সন্ধানে বনহুর আজ সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কলকাতা শহর চষে ফিরেছে।

বনহুর দ্রুত শয্যা ত্যাগ করে এগিয়ে গেলো, —হুইসন! হুইসন তুমি---কিন্তু ওকে ধরতে গিয়ে চমকে উঠলো বনহুর—হুইসনেব পিঠের বাম পাশে একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা বিঁধে রয়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে তার জামা-প্যান্ট। ঢলে পড়ে যাচ্ছিলো হুইসন বনহুর ওকে তাড়াতাড়ি সম্মুখের সোফাটায় বসিয়ে দিয়ে দ্রুত হস্তে লাইট জ্বাললো। এতোক্ষণ ডিমলাইটের আলোতে হুইসনকে চিনলেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না।

লাইটের উজ্জ্বল আলোতে বনহুর স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলেও বুদ্ধি হারালো না, ক্ষিপ্ততার সঙ্গে ছোরাখানা খুলে ফেললো একটানে। সঙ্গে সঙ্গে তাজা রক্ত ফিন্‌কী দিয়ে বেরিয়ে এলো।

বনহুর বুঝতে পারলো হুইসনের মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই। ঝুকে পড়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—হুইসন্ বলো? বলো কি বলতে এসেছো আমার কাছে? কি বলতে চাও তুমি---

কিন্তু হুইসন অনেক চেষ্টা করেও একটি কথা উচ্চারণ করতে পারলো না, কিছু বলতে গেলো অমনি ঘাড়টা ঢলে পড়লো এক পাশে। বনহুর বার বার ঝাকুনি দিয়ে ডাকলো—হুইসন--হুইসন-হুইসন---

হুইসনের প্রাণবায়ু তখন অসীমে বিলীন হয়ে গেছে।

বনহুর হুইসনের মাথাটা সোফায় ঠেশ দিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো চোখমুখ তার কঠিন হয়ে উঠেছে। না জানি হুইসন তাকে কি সংবাদ জানানোর জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। গতরাতে সে হোটেলে সঙ্গীদের বলে এসেছিলো, আমি মিঃ আলমের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কিন্তু সে তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায়নি। ফিরেও যায়নি সে আর। কোথায় আট্‌কা পড়েছিলো হুইসন? কে তাকে বন্দী করে রেখেছিলো? আর কেনই বা তাকে এভাবে ছোরাবিদ্ধ করে হত্যা করলো? কি বলার জন্য শেষ পর্যন্ত হুইসন রাতের অন্ধকারে তার কাছে ছুটে এসেছিলো? বনহুর ক্ষিপ্তের মত চঞ্চল হয়ে উঠলো, একটি কথাও যদি হুইসন বলে যেতে পারতো তবু বনহুর স্বস্তি পেতো। বনহুরের ইচ্ছা হলো নিজের দেহে নিজে দংশন করে। চঞ্চলভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করে সে। ভাবে কে এই নৃশংস হত্যাকারী যে পরপর হত্যা করে চলেছে। ম্যাকমারা ও এথোলকে হত্যা করেও নিশ্চিন্ত হয়নি—আবার সে হত্যা করলো হুইসনকে---বনহুর উন্মাদের মত টেবিলে মুষ্টিঘাত করলো, হুইসনের মৃতদেহ তার কক্ষের সোফায় শায়িত— ভুলে গেলো সে কথা। দাঁতে-দাঁতে পিষে তাকালো মুক্ত জানালা দিয়ে ঘুমন্ত মহানগরীর দিকে। কতক্ষণ যে একভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো বনহুর খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে পড়লো—কক্ষে লাশ রেখে এভাবে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে বিভ্রাট ঘটবে--তাড়াতাড়ি বনহুর ফিরে এলো লাশের পাশে। দ্রুত হস্তে হাতড়ে চললো হুইসনের জামার পকেটগুলো যদি কোনো কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়।

বনহুর হুইসনের জামার পকেটে হাত পুরে খুঁজে চলেছে, রক্তে তার হাত দু'খানা চুপ্‌সে উঠেছে। একটা কিছু পাওয়া গেলো না হুইসনের পকেটে। বনহুর ছোরাখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখছে ঠিক্ সেই দণ্ডে কক্ষে প্রবেশ করলো আর্থার। তার পিছনে পুলিশ ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ, ও, সি, জয়দেব ভৌম আর দুজন পুলিশ।

বনহুর ছোরা হস্তে ফিরে তাকাতেই মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হলো। উঠে দাঁড়ালো সে—দু'চোখে তার বিস্ময়।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ রিভলভার উদ্যত করে ধরলেন—খবরদার নড়বেন না।

আর্থার দাঁত পিষে বললো—আলম, তুমি সবার চোখে ধূলো দিতে পারো কিন্তু আমার চোখে নয়।

বনহুর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকালো আর্থারের মুখে, কিন্তু একটি কথাও সে উচ্চারণ করলোনা।

ততক্ষণে শ্যালন এসে দাঁড়িয়েছে, তার নিদ্রাজড়িত দু'চোখে রাজ্যের ভয়-ভীতি আর বিস্ময়।

আর্থার বললো— ঘন্টাখানেক পূর্বে কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে আমার ঘুম ভেংগে গিয়েছিলো। এ ঘর থেকেই কথার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আমি দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখি—হুইসনের দেহ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, আর ছোরা হস্তে দাঁড়িয়ে আছে আলম। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার কক্ষে ফিরে যাই এবং ফোন করি পুলিশ অফিসে---

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ এবং মিঃ ভৌম অল্পক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর মিঃ রাজেন্দ্রনাথের রিভলভারে হাত দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে।

ছিট্‌কে পড়ে রিভলভারখানা কয়েক হাত দুরে।

বনহুর মুহূর্ত মধ্যে ওদিকের মুক্ত জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। জানালায় কোনো সিকের ফর্মা বা কাঁচের শার্শী আটকানো ছিলো না। চুড়ান্ত গরম বোধ করায় বনহুরই খুলে দিয়েছিলো কাঁচের শার্শীগুলো কিছুক্ষণ পূর্বে। এক্ষণে তারই কাজে এলো, শার্শী খুলে রাখার জন্য পালাতে সক্ষম হলো সে।

গাড়ি [illegible]দায় আর্থারের দেয়া তার গাড়িখানা পার্ক করা ছিলো বনহুর ক্ষিপ্রভাবে [illegible]টে গিয়ে চেপে বসলো ড্রাইভিং আসনে। তারপর আর কে পায় [illegible]

সাঁ করে বেরিয়ে গেলো বনহুরের মডেল কুইন গাড়িখানা। গেট পার হতেই শুনতে পেলো পিছনে পরপর কয়েকবার রাইফেলের গুলীর শব্দ।

হঠাৎ এভাবে ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ অপদস্ত হয়ে যাবেন ভাবতেও পারেননি। তিনি প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে পুলিশদ্বয় এবং ও, সি, মিঃ ভৌমকে আদেশ দিলেন, ওর গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়তে। কিন্তু যখন মিঃ ভৌম আর পুলিশদ্বয় গাড়ি-বারান্দায় এসে গুলী ছুড়লেন তখন বনহুরের গাড়ি আলবার্ডের লৌহগেট পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথও গুলী ছুড়লেন ছুটে এসে। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য হলেন না। এবার তিনি মিঃ ভৌমকে পুলিশদ্বয় সহ মিঃ আলমের গাড়িখানাকে ফলো করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

ইন্সপেক্টারের আদেশ পেয়ে আর এক দণ্ড বিলম্ব না করে মিঃ ভৌম পুলিশদ্বয় সহ পুলিশ ভ্যানে চেপে বসলেন।

বনহুরের গাড়িখানা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মিঃ ভৌম এবং পুলিশদ্বয় অনুসরণ করলো বনহুরের গাড়িখানাকে।

ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন হুইসনের লাশের পাশে।

আর্থারও মিঃ রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলো, সেও ফিরে আসে কক্ষমধ্যে।

শ্যালন তখনও দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে, তাকিয়ে আছে সে নিহত হুইসনের মুখের দিকে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! আলম হুইসনকে হত্যা করেছে—কিন্তু কেন সে ওকে হত্যা করলো? তবে কি আলম জানতে পেরেছিলো—হুইসন তার পিতা এবং এথোলের হত্যাকারী? তাই বুঝি আলম হুইসনকে হত্যা করেছে---

শ্যালন যখন নানা রকম এলোমেলো চিন্তা করে চলেছে, তখন বললো আর্থার—শ্যালন, তোমার বাবাকেও মিঃ আলম হত্যা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং মিঃ এথোলকেও---

না, না। এ হতে পারে না, আমার বাবাকে কিছুতেই সে হত্যা করতে পারে না। এমন কি এথোলকেও হত্যা করতে পারে না আলম।

রাজেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন—মিস শ্যালন, আপনি মেয়েমানুষ, এসব রহস্যপূর্ণ কাজ বুঝবেন না।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ হুইসনের লাশ পরীক্ষা করতে থাকেন। এবং লাশ পরীক্ষা শেষে আর্থারের নিকট হতে হুইসন হত্যার সাক্ষ্য গ্রহণ করে ডায়রী লিখলেন।

❑

বনহুরের গাড়ি সোজা পার্ক সার্কাস রোড হয়ে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। পিছনে প্রায় দু'শো গজ দূরে তীর বেগে ছুটে আসছে পুলিশ ভ্যান। মিঃ ভৌম স্বয়ং রাইফেল হস্তে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন—সীমার মধ্যে এলেই তিনি গুলী ছুড়ে সামনের গাড়ির চাকার টায়ার ফাটিয়ে দিবেন। কিন্তু কিছুতেই বনহুরের গাড়িখানাকে লক্ষ্যের মধ্যে আনতে পারছেন না।

সুদক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালাচ্ছে বনহুর। গাড়ির হ্যাণ্ডেলে হাত রেখেই একবার বাম হস্তের কব্জির উপর রেডিয়াম হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো সে। রাত পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। কলকাতা শহর সম্পূর্ণ সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। যদিও দু'একটা গাড়ি মাঝে মাঝে পথে দেখা যাচ্ছিলো, সেগুলো তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করছিলো না বনহুরের। ডবল স্পীডে গাড়ি ছুটছে।

বনহুরের গাড়ি এবার পার্ক সার্কাস রোড ত্যাগ করে করেয়া রোড ধরে অগ্রসর হলো। সামনের আয়নায় দৃষ্টিকোণে দেখে নিচ্ছিলো, পিছনের গাড়িখানার সার্চলাইট দুটো তীর বেগে ছুটে আসছে। বনহুর এতোক্ষণ পুলিশ ভ্যানটাকে এড়িয়ে অন্য পথে উধাও হতে পারতো, কিন্তু গভীর রাত্রির জনহীন ফাঁকা পথ— কাজেই সহজে এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

দক্ষ পুলিশ ড্রাইভার মরিয়া হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, কিন্তু তার চেয়েও দক্ষ ড্রাইভার দস্যু বনহুর। কিছুতেই তাকে আয়ত্বের মধ্যে আনতে পারছে না পুলিশ ভ্যানখানা। করেয়া রোড অতিক্রম করে ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীটে প্রবেশ করলো বনহুর। ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের মাঝপথে গিয়ে একটা গলি ধরে ছুটলো এবার বনহুরের গাড়িখানা। কিছুক্ষণ অবিরাম গাড়ি চালিয়ে এ পথ সে-পথ করে এক সময় পুলিশ ভ্যানটাকে ছাড়িয়ে নিলো সে। তারপর আরও কিছুক্ষণ এলোপাথাড়ি নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে ইডেন গার্ডেনের সম্মুখে এসে গাড়ি রাখলো বনহুর।

ততক্ষণে ভোরের হাওয়া দোলা জাগিয়েছে ইডেন গার্ডেনের মনোরম পুষ্পবৃক্ষের শাখায় শাখায়। অজানিত ফুলের সুরভি প্রাতঃভ্রমণকারীদের মনে এনেছে এক অপরিসীম আনন্দস্রোত। কতগুলো গাড়ি গার্ডেনের গেটের পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

রাত পাঁচটা থেকে সম্পুর্ণ দেড় ঘন্টা ধরে অবিরাম গাড়ি চালিয়ে তবেই না পুলিশ ভ্যানটার নিপুণ দৃষ্টি থেকে নিজের গাড়িখানাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে বনহুর। এখন ভোর ছ'টা বেজে চল্লিশ মিনিট হয়েছে। বনহুর হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে প্রবেশ করলো।

বেশ কিছু সংখ্যক প্রাতঃভ্রমণকারী গার্ডেনে ভোরের হাওয়া উপভোগ করছেন।

বনহুর বেশ ক্লান্ত বোধ করছিলো। একটা নির্জন স্থান দেখে সেখানে বসে পড়লো। হাত দু'খানা দিয়ে ঘামে ভেজা জামার কলার দু'টো উঁচু করে নিয়ে বুকে ফুঁদিয়ে ক্লান্তি দূর করবার চেস্টা করছিলো।

এমন সময় কিছুদূরে নজর চলে গেলো তার, স্পষ্ট দেখলো— মিঃ ভৌম আর পুলিশদ্বয় ইডেন গার্ডেনের মধ্যে এগিয়ে আসছে। চারদিকে সর্তক দৃষ্টি মেলে এগুচ্ছে তারা। বনহুর বুঝতে পারলো—তার সন্ধানেই পুলিশ কর্মচারীত্রয় এ গার্ডেনে আগমন করেছেন, কিন্তু আশ্চর্য। কি করে এখানে তারা ঠিক ঠিক এসে হাজির হয়েছে।

বনহুরের বিশ্রাম আর হলো না, কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারী ভদ্রলোক তার পাশ দিয়ে গল্প করতে করতে গার্ডেন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। বনহুরও তাদের সঙ্গে মিশে অগ্রসর হলো। কিন্তু বনহুরের গাড়ি রয়েছে এক নম্বর গেটে। এটা দু'নম্বর গেট। বনহুর তাকালো এদিক-ওদিক, ওপাশে কয়েকটা প্রাইভেট কার দাঁড় করানো রয়েছে। একটা কারে ড্রাইভার বসে ঝিমুচ্ছিলো, ভোরের হাওয়ায় তার দু'চোখে ঘুমের পরশ লেগেছে।

বনহুর পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলো রিভলভারখানা তার পকেটে ঠিক জায়গায় আছে কিনা। বনহুর বুদ্ধি করে রিভলভারখানা পকেটে রেখেছিলো, না হলে ওটাকে সঙ্গে নেবার সময় তার হতো না। অবশ্য রিভলভারখানা পকেটে রাখার উদ্দেশ্যও ছিলো। বনহুর বাইরে বের হবে কিনা এ নিয়েই ভাবছিলো, ঠিক সে মুহূর্তে তার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো হুইসন্। কাজেই রিভলভার তার পকেটেই রয়ে গিয়েছিলো।

এখন ওটার নিতান্ত প্রয়োজন।

বনহুর ওদিকের গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো, ড্রাইভার সীটের সঙ্গে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঝিমুচ্ছে। মাঝে মাঝে মাথাটা গড়িয়ে যাচ্ছিলো সীটের এক পাশে, আবার সরিয়ে সোজা করে নিচ্ছিলো মাথাটা সে।

বনহুর গাড়িটার একেবারে কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের কাঁধে হাত রেখে ব্যস্তভাবে বললো—ড্রাইভার—ড্রাইভার---

এ্যাঁ-- চোখ রগড়ে তাকালো ড্রাইভার।

বনহুর পূর্বের ন্যায় ব্যস্তকণ্ঠে বললো—আরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছো, সাহেব যে ডাকা ডাকি শুরু করেছেন। যাও যাও, দেখো কি হলো তাঁর।

সাহেব ডাকছেন, আমাকে?

হাঁ, যাও চট করে---

ড্রাইভার তার আসন ত্যাগ করে দ্রুত নেমে দৌড় দিলো গার্ডেনের ভিতরে।

বনহুর উঠে বসলো ড্রাইভিং আসনে, তার পর সাঁ করে বেরিয়ে গেলো ইডেন গার্ডেনের দু'নম্বর গেটের সম্মুখ হতে। এবার কে নাগাল পায়।

কলকাতা নগরী এখন জনমুখর হয়ে উঠেছে।

পথঘাট জনাকীর্ণ।

অসংখ্য গাড়ির ঝাঁকে বনহুরের গাড়ি মিশে গেলো।

কোথায় চলেছে, কোথায় যাবে—কোনই স্থিরতা নেই বনহুরের। দিক্-হারার মত একদিকে চলেছে সে। গাড়ির হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে তাকিয়ে আছে সম্মুখের দিকে। এতোক্ষণে গাড়ির মালিক হয়তো তার গাড়ির নম্বর জানিয়ে পুলিশ অফিসে ডায়রী করে দিয়েছে কাজেই বেশিক্ষণ এ গাড়ি ব্যবহার করা তার চলবে না। ঐ যে কথায় বলে—নিয়তি কাউকে পরিহার করে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও তাকে ধান ভানতে হয়। বনহুর খুন না করেও তাকে খুনী বনতে হয়েছে। এতোক্ষণে পুলিশ মহল তার সন্ধানে সমস্ত কলিকাতা চষে ফিরছে। শুধু একটি নয়— তিনটি খুন! যে ব্যক্তি ম্যাকমারা এবং এথোলকে খুন করেছে—সেই খুন করেছে হুইসন স্মিথকে। কিন্তু পুলিশ তাকেই সন্দেহ করেছে। এর মূল হলো আর্থার। আর্থারের ভুলের জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বনহুর চেয়েছিলো বাংলার মাটিতে বাঙ্গালী সন্তানের মত সুশান্ত হয়ে কাটাবে। ভুলে যাবে সে তার বিগত জীবনের কথা। অন্ততঃ যতদিন বাংলাদেশে থাকবে ততদিনের জন্য। তা হলো কই?---

বনহুর নির্দোষী হয়েও এখানে দোষী। তাকে এখন অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াতে হবে। নিজের জন্য এতোটুকু বিচলিত নয় সে। মনে তার প্রচণ্ড আক্রোশ —কে এই হত্যাকারী, কেন সে পর পর হত্যা করে চলেছে। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে, আবিস্কার করতে হবে তার খুনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু খুনীকে খুঁজে বের করতে এবং উদ্দেশ্যকে আবিস্কার করতে চাই প্রচুর অর্থ। অর্থ ছাড়া সম্ভব নয় কিছুতেই একাজ।

দস্যু বনহুর আজ অর্থশূন্য।

সমস্ত দিন বনহুর গাড়ি নিয়ে অসংখ্য গাড়ির ভীড়ে ডুবে রইলো।

ক্ষুধায় পেটের মধ্যে তার জ্বালা করছে, পকেটে হাত দিয়ে দেখলো কয়েকটা টাকা মাত্র তার সম্বল আছে। একটা হোটেলের সম্মুখে গাড়ি রেখে কিছু খেয়ে নিলো সে।

তারপর আবার ছুটলো গাড়ি নিয়ে।

অবশ্য কারণও ছিলো, সন্ধান করে ফিরছে এ মহানগরীর কোথায় সে আস্তানা গ্রহণ করবে। কোথা থেকে সে তার কাজ ঠিকভাবে চালিয়ে যাবে। এক এক করে অনেক জায়গাই ঘুরে ঘুরে ফিরলো বনহুর—ভবানীপুর, কালিঘাট, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া, আলিপুর, মেছোয়াবাজার, বড় বাজার, রাজা বাজার, শ্যামবাজার, দমদম, ব্যারাকপুর, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর, এমন কি গোবরা গোরস্থানেও সে গাড়ি নিয়ে ছুটলো। গেলো সে নিমতলা শ্মশনঘাটে; আরও বহু জায়গা বনহুর চষে বেড়ালো—কলকাতা শহরের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে। নিজের ক্ষুধা নিবারণের চেয়ে গাড়ির ক্ষুধা মিটিয়ে নিলো সে কয়েকবার।

কলিকাতা নগরীর বুকে এক সময় নেমে এলো রাতের অন্ধকার। অসংখ্য তারকামালার মত জ্বলে উঠলো ইলেকট্রিক আলোগুলো।

বিচিত্রময় মহানগরী রূপ নিলো বৈচিত্রময়ী রূপে।

দিবালোকের কর্মকোলাহলের মুখরতা আরও গাঢ় হয়ে এলো। পথচারী জনগণের মধ্যে দেখা দিলো আরও চঞ্চলতা। সারাদিনের কর্মব্যস্ত জনগণ ক্লান্তির অবসাদ মুছে ফেলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কেউ বা বাড়ি ফেরার তাগিদে ব্যস্ত, কেউ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের আশায় উন্মুখ। কেউ বা ক্লাব আর ফাংশানে। কেউ ছুটেছে থিয়েটার বা সিনেমা হলের দিকে। আর কেউ বা চলেছে পরিবার পরিজন নিয়ে বন্ধু-বান্ধবীর আমন্ত্রণে যোগ দিতে।

কত জনার কত কাজ, সবাই নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। পথের ধারে ভিখারীর দল সন্ধ্যা ভ্রমণকারী বাবুদের কাছে দুটো পয়সার আশায় গলার জোর আরও বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচাচ্ছে—বাবু দুটো পয়সা দিন, বাবু দু'টো পয়সা দিন---

ওয়াসেল মোল্লার দোকানের সম্মুখে এক গাদা গাড়ির পাশে এসে থামলো একটা গাড়ি। নেমে এলো গাড়ি থেকে বনহুর গোটাদিন ভর সে বহু জায়গায় ঘুরে ফিরেছে। ওদিকে ভিখারীটা চেঁচাচ্ছে—বাবু দুটো পয়সা দিন, বাবু দুটো পয়সা দিন---

বনহুর পকেটে হাত পুরে হাতড়ে একটা সিকি বের করে ভিখারীর হাতে ছুড়ে দিলো, তারপর প্রবেশ করলো দোকানের মধ্যে।

বনহুর ভিতরে চলে যেতেই ভিখারী পাশে এক কম্বল মুড়ি দেয়া অন্ধকে বললো—মিঃ রবিন, এটাই হলো সেই গাড়ি, যে গাড়ির সন্ধানে আমরা এতোক্ষণ অনেক জায়গায় সন্ধান করে ফিরছি।

এ্যাঁ, সত্যি আপনি গাড়ির নাম্বার লক্ষ্য করেছেন?

হাঁ, দেখুন--ভিখারী নোটবুক বের করে মিলিয়ে দেখে নিলো।

মিঃ রবিন বললেন—মিঃ ঘোষ আপনি ঠিক্ আবিস্কার করে ফেলেছেন।

যা হোক, লোকটা যতক্ষণ না ফিরে আসছে ততক্ষণ এভাবেই অপেক্ষা করতে হবে। ভিখারী বেশী মিঃ ঘোষ বললেন।

মিঃ ঘোষ এবং মিঃ রবিন সি, আই, ডি পুলিশ অফিসার। সকালে ব্যারিষ্টার সমরেশ বিশ্বাসের গাড়িখানা হঠাৎ এ ভাবে উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত থানায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তিনি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। গাড়ি এবং গাড়ি হরণকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারলে তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে।

মিঃ ঘোষ এবং মিঃ রবিন কয়েকজন পুলিশকে আশে পাশে গোপনে রেখে তারা ভিখারীর ছদ্মবেশে ওয়াসেল মোল্লার দোকানের সম্মুখের গাড়িগুলোর নাম্বার লক্ষ্য করছিলেন। শুধু ওয়াসেল মোল্লার দোকানের সম্মুখেই নয়, এমনিভাবে সি আই ডি পুলিশ শহরের বহু স্থানে—নাম করা হোটেল, দোকান, ক্লাব সিনেমা হলের এবং নিউমার্কেটের সম্মুখে সজাগ পাহারা দিচ্ছিলো। যে সে কথা নয়—ব্যারিস্টার বিশ্বাসের গাড়ি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের গাড়ি—যেমন করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে।

মিঃ ঘোষের নিপুণ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি গাড়িখানা। মিঃ ঘোষ বাঁশীতে ফুঁ দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশে থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন ছদ্মবেশী পুলিশ। ভিখারীবেশী মিঃ ঘোষ তাদের কানে কানে বললেন—তোমরা নিকটেই অপেক্ষা করবে, গাড়ি এবং গাড়ি হরণকারীকে পাওয়া গেছে।

লোকটা দোকানে প্রবেশ করেছে, ফিরে এলেই আমি হুইসেল বাজাবো, ততক্ষণাৎ তোমরা গাড়ি এবং গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করবে।

মিঃ ঘোষের নির্দেশ অনুযায়ী সি আই ডি পুলিশ এদিক—ওদিক গা ঢাকা দিয়ে রইলো।

বনহুর ভিতরে প্রবেশ করে একটা সিল্ক জমকালো বড় রুমাল খরিদ করে নিলো, তারপর পূর্বের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে অপর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। এবার মোটর গাড়ির মায়া ত্যাগ করে ট্রাম গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরে উঠে পড়লো। অসংখ্য প্যাসেঞ্জারের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে।

কণ্ডাকটারের গলা ফাটা চীৎকারে কান ঝালাপালা করছিলো। একটানা হেঁকে চলেছে কণ্ডাকটার—ভবানীপুর---কালিঘাট--বালিগঞ্জ--

বনহুরের গন্তব্যস্থান কোথায় কোন্ দিকে কে জানে।

❑

হুইসনের মৃতদেহের মর্মান্তিক দৃশ্যটাই ভাসছিলো আর্থারের চোখের সম্মুখে। রক্তমাখা দেহ, মৃত্যুমলিন বিকৃত মুখ, আর তার বুকের সেই ক্ষতটা যে ক্ষত দিয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো আলমের কক্ষের মেঝের কার্পেটে। কি ভয়ানক সাংঘাতিক দৃশ্য! কয়েক দিন পূর্বেই নিহত হয়েছেন তার বড় কাকা ম্যাকমারা। এ বাড়িতেই তিনি নিহত হয়েছেন। পর পর দুটি হত্যাকাণ্ড কম কথা নয়।

দুটি হত্যাকাণ্ডে আর্থারের বাড়ির সবাই ভীত-আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, তারপর আলবার্ডকে মিথ্যা খুনী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে শুধু আর্থারই নয়, আর্থার জননী মিসেস এলিনা বার্ডও একেবারে মুষড়ে পড়েছেন।

আর্থার তার পিতার কক্ষেই শোয়।

এ কক্ষেই লোহার সিন্দুক আছে। অর্থ এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি এ কক্ষেই থাকে, কাজেই তাকে এ ঘরে ঘুমাতে হয়।

সমস্ত বাড়িটায় একটা ভীতিকর ভাব জেগে আছে।

আর্থারের চোখে ঘুম নেই।

দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও আর্থার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসছে না। একটু সামান্য খুট্ খাট্ শব্দতেই চমকে উঠছে

সে। না জানি ম্যাকমারা কাকা বা হুইসন স্মিথ ভূত হয়ে না তার সম্মুখে এসে হাজির হয়!

ওদিকে তার কক্ষ আর মায়ের কক্ষের মাঝামাঝি কক্ষটায় শ্যালন শোয়। বেচারী বালিকা মাত্র; ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সর্বক্ষণ। পিতার মৃত্যুর পর সে আলমকেই তার একমাত্র ভরসা ভেবে আঁকড়ে ধরেছিলো। এই বাংলা দেশে তার আপন বলে কেউ ছিলো না। যদিও আলবার্ড পরিবার তার পিতার আত্মীয় তবুও সে ওদের কাউকে নিজের করে নিতে পারছিলো না। আলমকে সে শুধু ভালই বাসতোনা, বিশ্বাস করতো আপন জনের চেয়ে বেশি— সেও খুনী! আলম খুনী—কথাটা স্মরণ হতেই শিউরে উঠে শ্যালন, সে বিশ্বাস করতে পারে না আলম খুনী। কিন্তু আর্থার তাকে এমনভাবে বলেছে বিশ্বাস না করেও যেন পারে না সে। আর্থার বলেছে—তার পিতা ম্যাকমারা এবং এথোল কাকাকেও নাকি আলম হত্যা করেছে। হুইসনকে হত্যা করতে সে নিজের চোখে দেখেছে। কি করে ছোরাখানা সমূলে বসিয়ে দিলো তার বুকে---

আর্থারের কথা শুনে আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলো শ্যালন—উঃ কি ভয়ঙ্কর। সরল মনে বিশ্বাস করেছিলো সে ওর কথাগুলো।

তবু মাঝে মাঝে মনে হতো শ্যালনের —আলম হত্যাকারী নয়। আর্থার মিথ্যা বলেছে; কিছুতেই তার মনে অবিশ্বাস আসতো না। আলমকে সে ভুলতে পারতো না কোনো সময়ের জন্য। প্রতিটি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করতো সে ওর। আলমের সঙ্গে জড়ানো স্মৃতিগুলো তার মনে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি করতো। বিছানায় শুয়ে ভাবতো ওর কথা। আলমকে সে যত নিষ্ঠুর শয়তান বলে ভাবতে চেস্টা করতো ততই যেন আরও সুন্দর দেবমূর্তি হয়ে ধরা দিতো ও তার কাছে।

ও ঘরে শ্যালন যখন আলম সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করে চলেছে, এ ঘরে তখন আর্থার ভয়ে শিউরে উঠছিলো। কিছুক্ষণ হলো তার কক্ষের পিছন জানালার শার্শীর বাইরে কিসের যেন খুট খুট আওয়াজ হচ্ছিলো। চাদরের ফাঁকে উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিয়েছিলো,কিন্তু কিছুই সে দেখতে পায়নি। আর্থারের মনে পড়েছিলো—অশরীরী আত্মা নাকি দেখা যায় না, তবে তাদের বিচরণ অস্তিত্ব নাকি বোঝা যায়। তবে কি ম্যাকমারা কাকা--- না হুইসনের আত্মা তার ঘরে প্রবেশ করার চেস্টা করছে। ভয়ে আর্থারের দেহ ভিজে চুপসে উঠছে। চোখ মুছে বিছানায় পড়ে রইলো সে অসাড়ের মত।

একটা শব্দ হলো, কেউ যেন লাফিয়ে পড়লো মেঝেতে।

তবে কি প্রেত-আত্মা কক্ষে প্রবেশ করলো। চাদরের নীচো থর্ থর্ করে কাঁপছে আর্থার। মনে মনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছে সে।

মেঝেতে জুতোর শব্দ হলো, কেউ যেন তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

আর্থারের হৃদপিণ্ড তখন ধরাস ধরাস করছে, এ বার অশরীরী আত্মা তাকে গলা টিপে হত্যা করবে। চীৎকার করে কাউকে ডাকবে তারও উপায় নেই, গলাটা ওর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যেন। চাদর সরিয়ে চোখ মেলে দেখবে তাও সাহস হচ্ছে না। না জানি প্রেত-আত্মার রূপটা কেমন—কি ভয়ঙ্করই না হবে! আর্থার কাঁপতে শুরু করেছে, আর প্রাণপণে স্মরণ করছে ঈশ্বরকে।

হঠাৎ তার মুখের চাদর সরে গেলো।

চমকে চোখ মেলে তাকালো আর্থার, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—কে, কে তুমি!

আমি হুইসনের হত্যাকারী!

তুমি আলম?

হাঁ। বনহুর তার মুখের কালো রুমালখানা একটানে খুলে নিয়ে পকেটে রাখলো, দক্ষিণ হস্তে তার উদ্যত রিভলভার।

আর্থার শয্যায় যেমন শুয়ে ছিলো তেমনি রইলো, ছাই-এর মত বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। এতো রাতে এমতাবস্থায় আলম কি করে প্রবেশ করলো তার কক্ষে। ভীতভাবে তাকালো আর্থার আলমের মুখের দিকে।

আলমের চোখ দিয়ে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। কঠিন তার মুখমণ্ডল। আর্থার তাকালো দরজার দিকে।

বনহুর দাঁত পিষে বললো—খবরদার চীৎকার করলেই তোমার অবস্থা হুইসনের মত হবে।

এখানে কেন তুমি? এখানে কেন, বলো?

হুইসনকে হত্যা করেছি, এবার তোমাকে। বনহুর আর্থারের শরীরের চাদর একটানে ছুড়ে ফেলে দিলো।

এতোক্ষণও শুয়ে ছিলো সে, উঠে বসবার সাহস তার হয়নি। বনহুরের রিভলভারখানার দিকে বার বার তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো। কখন বুঝি ওর একটা গুলী তার জীবনের ইতি ঘটিয়ে দেয়। বনহুর চাদরখানা ছুড়ে ফেলে দিতেই কম্পিতভাবে উঠে বসলো আর্থার; শয্যায় হাত জুড়ে বললো—আমি---আমি কি অন্যায় করেছি তোমার?

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর—হুইসন যে অপরাধ করেছিলো!

আর্থার কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই বনহুর রিভলভার চেপে ধরলো তার বুকে—চাবি দাও।

চাবি! কিসের চাবি?

সিন্দুকের।

তুমি শুধু খুনীই নও, তুমি চোর-ডাকু---

আমি চোর-ডাকু-খুনী যা বলো সব। দাও চাবি, দাও শীঘ্র।

কেন , কি করবে চাবি তুমি?

তোমার বাবাকে নির্দোষ প্রমাণিত করে হাজতবাস থেকে মুক্ত করে আনবো, তাই আমার প্রয়োজন প্রচুর অর্থ।

অর্থ!

হাঁ, বিলম্ব-করো না, বা চালাকি করতে যেও না —মরবে।

আর্থারের মুখ ছাই-এর মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, আজই সে ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিয়ে এনেছে, কালকেই তার কারবারের জন্য প্রয়োজন।

চাপা গর্জন করে উঠে বনহুর—চাবি বের করো। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের আগাটা ঠেকায় সে আর্থারের বুকে।

আর্থার ভয় পেয়ে গেছে—হুইসনকে যে হত্যা করেছে, তাকে হত্যা করা তার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আর্থার চাবির গোছা বনহুরের হাতে তুলে দিলো।

বনহুর চাবি নিয়ে লৌহ-সিন্দুক খুলে ফেললো। দ্রুত হস্তে টাকার ফাইলগুলো পকেটে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চাবির গোছা ছুড়ে দিলো আর্থারের হস্তে, তারপর বললো—শ্যালনকে দেখাশোনা করো আর্থার। তার প্রতি যদি কোনো রকম অন্যায় আচরণ করো তাহলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনো। আসি—বাই বাই--

বনহুর যে পথে এসেছিলো সে পথে বেরিয়ে গেলো।

আর্থার এবার কম্পিত হস্তে রিসিভারখানা তুলে নিলো হাতে—হ্যালো, হ্যালো, লালবাজার পুলিশ অফিস---

অল্পক্ষণেই পুলিশ এসে হাজির হলো। মিঃ ভৌম এবং কয়েকজন পুলিশ ফোন পেয়েই ছুটে এলেন গাড়ি নিয়ে। কিন্তু তাঁরা কোনো কিছুই করতে পারলেন না। রাতেই খবরটা জানানো হলো পুলিশ সুপার মিঃ বোসের কাছে। তিনি জানালেন কমিশনার বিনয় সেনকে।

পরদিন দৈনিক সংবাদ-পত্রিকায় এ খবর বের হলো, তার সঙ্গে বের হলো পর পর কয়েকটি হত্যা-রহস্য। ইতিপূর্বেও কলিকাতা শহরময় এ হত্যা-ব্যাপার নিয়ে একটা ভীষণ চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। তারপর আবার এ রহস্যজনক ডাকাতি।

শহরে নানাস্থানে পত্রিকা সংবাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, হোটেলে, ষ্টলে, দোকানে—এমনকি সিনেমা হলেও এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আজ রাতের ডাকাতির ব্যাপার নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হলো।

ক্যালকাটা গ্র্যাণ্ড হোটেল।

একটি বিশিষ্ট কামরায় সোফায় বসে সিগারেট পান করছিলো আর দৈনিক-সংবাদ পত্রিকাখানা দেখছিলো দস্যু বনহুর। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে গত রাতে পার্ক সার্কাসের একটি বাড়িতে অদ্ভুত ডাকাতির সংবাদটা।

বনহুরের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কুণ্ডলি পাকানো ধূম্ররাশির দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠলো—দস্যু বনহুরের প্রথম পদক্ষেপে এটা---পরক্ষণেই ডাকলো বনহুর—বয়, —বয়---

কক্ষে প্রবেশ করলো একটি বয়—স্যার, ডাকছেন?

হাঁ শোন, কয়েক দিনের মধ্যে আমার গাড়ি আসছে, একটা গ্যারেজের ব্যবস্থা করো।

আচ্ছা স্যার, কোনো অসুবিধা হবে না।

আমার খাবার নিয়ে এসো।

বয় বেরিয়ে গেলো।

অল্পক্ষণ পরে টেবিলে খাবার সাজিয়ে বললো—স্যার খাবার দিয়েছি।

বনহুর পত্রিকাখানা রেখে উঠে খাবার টেবিলে এসে বসলো।

বয় পরিবেশন করছিলো।

বনহুর বললো—তোমার নাম কি?

বয় হেসে বললো—স্যার, আমার নাম মিঠু। গরীব লোক আমরা--

তাহোক। মিঠু, তোমাকে আমি নাম ধরে ডাকবো, কেমন?

তাই ডাকবেন স্যার।

আচ্ছা মিঠু, এ হোটেলে তুমি কতদিন কাজ করছো?

বছর তিন-চার হবে।

দেখ মিঠু, সত্যি তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে।

কত সাহেব আসেন আবার চলে যান; কিন্তু কেউ আমাদের সঙ্গে আপনার মত এমন করে কথা বলে না। আপনাকেও আমার খুব ভাল লেগেছে স্যার।

সত্যি! বনহুর খেতে খেতে আনন্দধ্বনি করে উঠে।

মিঠু হাসে—হাঁ স্যার।

খাওয়া শেষ হলে বনহুর দশ টাকার একখানা নোট গুঁজে দেয় মিঠুর হাতে—তোমার বখশীস্।

দশ টাকা।

হাঁ। শোন মিঠু, আমাকে অনেক সময় নানা কাজে বাইরে ঘোরাফেরা করতে হবে, কারণ আমি কলকাতায় জরুরী এক কাজ নিয়ে এসেছি, বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।

টাকাটা খুশী হয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বললো মিঠু—স্যার আমাকে সব সময় পাবেন। যা বলবেন তাই করবো।

বেশ, আমার কথা মতো কাজ করো, কেমন?

করবো স্যার।

বনহুর জামা-কাপড় পরে নিয়ে তখনকার মত বেরিয়ে পড়লো, ক্যাবিনে তালা বন্ধ করে চাবিটা নিজের পকেটে রাখলো সে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসলো বনহুর, ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো—ভবানীপুর।

❑

ডইসন নিহত হবার পর ম্যাকমারার ছাত্রগণ দেশে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তারা আর একটি দিনও কলকাতায় থাকা উচিৎ মনে করছে না।

বনহুর আজ তাদের নিকটেই উপস্থিত হলো গিয়ে।

ম্যাকমারার ছাত্রগণ মিঃ আলমকে পেয়ে সবাই ঘিরে ধরলো, একবাক্যে সবাই জানালো—আর তারা থাকতে রাজি নয়।

বনহুরও এতে আপত্তি করলো না, এবং তাদের যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালো। শ্যালনকেও তার দেশে পৌঁছে দেবার জন্য নিয়ে যেতে বললো সে।

ম্যাকমারার ছাত্রদলের নেতা মিঃ লুই, শ্যালনকে দেশে নিয়ে যাবার জন্য স্বীকার করলো। লুই নিজে গেলো পার্ক সার্কাসে আর্থারের বাড়িতে, বললো—আমরা চলে যাচ্ছি, চলো তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দেবো।

কিন্তু শ্যালন কিছুতেই স্বীকার হলোনা, সে মৃত পিতার কথা স্মরণ করে রোদন করে চললো। তারপর কান্না থামিয়ে বললো—দেশে আমি কার কাছে ফিরে যাবো, কে-ই বা আছে আমার! আমি যাবো না, আলমকে ছাড়া আমি কোথাও যাবোনা।

আর্থার বোঝালো—সে একজন খুনী-হত্যাকারী। তোমার পিতাকেও সে হত্যা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এতো শোনা সত্ত্বেও শ্যালন আলমকে অবিশ্বাস করতে পারলো না। সে বললো—আমি জানি, সে হত্যাকারী নয়! আমার মন বলছে সে নির্দোষ।

মিঃ লুইও এ কথা বিশ্বাস করতে পারেনি, মিঃ আলম যে হুইসনকে হত্যা করেনি, এটা তারা জানে। এতোদিন তারা আলমের সঙ্গে এক সাথে কাটিয়েছে, ওকে চিনতে বাকী নেই তাদের। কাজেই আলম যে তাদের নিকটে গিয়েছে এবং এক্ষণে সেখানেই অবস্থান করছে এ কথা প্রকাশ করে না লুই আর্থারের নিকটে।

শ্যালনের কাছ থেকে বিফল হয়ে ফিরে আসে লুই হোটেলে। সব কথা খুলে বলে তার দলবল এবং মিঃ আলমের কাছে। শ্যালন আর দেশে ফিরে যেতে রাজি নয়। দেশে তার নাকি আপনজন বলতে কেউ নেই। তা'ছাড়া আলমকে সে কিছুতেই কলকাতায় রেখে ফিরে যাবে না।

কথাটা শুনে হাসলো বনহুর, কোনো উত্তর দিলো না মিঃ লুই এর।

শেষ পর্যন্ত ম্যাকমারার ছাত্রগণ শ্যালনকে কলকাতায় রেখেই ফিরে যাওয়া মনস্থ করে নিলো।

বনহুর নিজে গিয়ে তাদের খিদিরপুর ডকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলো। জাহাজে যাতে ছাত্রগণের কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য বনহুর নিজ অর্থ ব্যয় করে সব ব্যবস্থা করে দিলো।

ম্যাকমারার ছাত্রদলকে বিদায় দিয়ে বনহুর যখন ফিরে এলো গাড়িতে, তখন নিজের অজ্ঞাতে তার চোখ দুটো ঝাঁপসা হয়ে এসেছিলো! বার বার মনে পড়ছিলো ম্যাকমারাকে, আজ ফিরে যেতো ম্যাকমারা তার দল-বল নিয়ে, কিন্তু নিয়তি তা হতে দিলো না।

ম্যাকমারা হলো নিহত আর সেই সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো সে নিজে। আর একটা সমস্যা তাকে আরও বিভ্রাটে ফেলছে—সে হলো শ্যালন--

হটাৎ বনহুরের চিন্তা ধারায় বাধা পড়ে ড্রাইভার বলে—বাবু সাব, আভি কাঁহা যাওগে?

চমক ভাঙ্গে বনহুরের, এ্যাঁ—চলো পার্ক সার্কাস--

সবেমাত্র আর্থার বেরিয়ে গেছে। পথে গাড়ি রেখে ফোনে জেনে নিয়েছিলো বনহুর, তাই সোজা সে চলে এলো আর্থারের বাড়ির সম্মুখে।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি পৌঁছতেই নেমে চলে গেলো সে শ্যালনের কক্ষে।

শ্যালন একটা বই পড়ছিলো, মুখে দারুণ চিন্তার ছাপ। এলোমেলো চেহারা, মলিন বিষন্ন করুণ দু'টি চোখ। বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই শ্যালন চোখ তুলে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো ওর গলা—আলম। আলম তুমি এসেছো?

শ্যালন কেন তুমি গেলেনা? তোমার বাবার ছাত্রগণ দেশে ফিরে গেলো আর তুমি---

না, না আমি যাবো না, আলম তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

সেকি কথা শ্যালন? এ তুমি কি বলছো?

আলম, আমি জানি তুমি একদিন না একদিন আসবে। আর আমি সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

শ্যালন আমি খুনি---

না, না তুমি খুনী নও। আমি জানি তুমি খুনী নও।

শ্যালন! বনহুর যেন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো, পুনরায় বললো—শ্যালন সত্যি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?

হাঁ আলম, জানি, আমি জানি তুমি খুনী নও।

শ্যালন!

বলো?

আমি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছিনে। বাড়ির অন্যান্য কেউ জেনে ফেললে এক্ষুণি আমাকে বিপদে পড়তে হবে।

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। বললো শ্যালন।

বনহুর ব্যস্তকণ্ঠে বললো—তুমি জানো না শ্যালন, আমি এখন কি অবস্থায় আছি। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

আবার আসবে বলো?

আসবো। শ্যালনের বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নেয় বনহুর, তারপর বলে—আসি—বাই, বাই---

বনহুর বেরিয়ে যায়, শ্যালন ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় বেলকোনির ধারে, ঝুঁকে পড়ে হাত নাড়ে।

বনহুরের গাড়িখানা অদৃশ্য হয়ে যায় মোড়ের বাঁকে।

❑

কমিশনার ভবন।

গভীর রাত।

একখানা গাড়ি গিয়ে থামলো কমিশনার ভবনের অনতিদূরে বাগানের ওপাশে। জমকালো পোশাক পরা একটি ছায়ামুর্তি নেমে এলো গাড়ি থেকে। কৌশলে বাগান মধ্যে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো কমিশনার ভবনের পিছন দিকে।

পুলিশ কমিশনার বিনয় সেন গভীর নিদ্রায় অচেতন।

হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেংগে গেলো তাঁর। চোখ মেলে তাকাতেই আড়ষ্ঠ হলেন তিনি। একটা জমকালো ছায়ামূর্তি তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

কক্ষ সম্পূর্ণ অন্ধকার।

বিনয় সেন জেগে উঠার পূর্বেই ডিম লাইট অফ্ করে দিয়েছিলো ছায়ামূর্তি।

কমিশনার জেগে উঠেই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কে---কে---কে তুমি?

চাপা কণ্ঠে বললো ছায়ামূর্তি-আমি ম্যাকমারার প্রেত আত্মা!

এ্যাঁ কি বললে? ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর বিনয় সেনের।

আমি তোমার মৃত বন্ধুর আত্মা।

বিনয় সেন বিছানায় সোজা হয়ে বসে চিৎকার করতে যাবেন। কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না। একে নিদ্রার ঘোর এখনও তাঁর সম্পূর্ণ কাটেনি, তারপর মৃত বন্ধুর আত্মা-- ফিস্ ফিস্ করে চাপা কণ্ঠে ছায়ামূর্তি কথা বলছিলো, সম্পুর্ণ অদ্ভুত সে কণ্ঠ স্বর ঠিক্ যেন ম্যাকমারার গলার আওয়াজ বলে মনে হলো তাঁর।

বিনয় সেন বললেন—কি চাও তুমি আমার কাছে?

যা তুমি নিয়েছো আমার বুক থেকে ছিনিয়ে।

না, না আমি তোমাকে দেবোনা! তুমিতো মরে গেছো কি করবে ওটা নিয়ে?

মরেও আমি স্বস্তি পাচ্ছিনা, তুমি আমাকে হত্যা করেছো আমিও তোমাকে হত্যা করে আমার জিনিস ছিনিয়ে নেবো।

আমি পুলিশ ডাকবো।

ফোন অকেজো হয়ে গেছে।

বিনয় সেন সুইচ্ টিপে আলো জ্বালাতে চেস্টা করলেন; কিন্তু আলো জ্বললোনা।

হেসে উঠলো ছায়ামূর্তি আলো জ্বলবেনা আর!

এ তুমি কি করেছো?

আমি প্রেত আত্মা; আমি সব পারি।

তোমাকে আমি গুলী করে হত্যা করবো।

চাপা স্বরে হেসে উঠলো ছায়ামূর্তি—হত্যা করবে! করো---

বিনয় সেন ড্রয়ার খুলে বের করলো রিভলভার। ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। কিন্তু একি গুলী তো বের হচ্ছে না। পর পর ফায়ার করে বিফল হলেন তিনি। এবার আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না।

ছায়ামূর্তি বিনয় সেনকে জাগাবার পূর্বেই মেইন সুইচ অফ্ করে দিয়েছিলো। আর বের করে নিয়েছিলো রিভলভারের গুলী। ফোনের কানেকশানও নষ্ট করে দিয়েছিলো সে। বিনয় সেনের মাথা ঘেমে দর দর করে ঘাম ঝরে পড়ছে। বিবর্ণ পাংশু মুখে ধপাস্ করে বসে পড়লেন বিছানায়। চীৎকার করে বললেন—পাবে না, সে জিনিস্ তুমি পাবে না।

তবে মরো--ছায়ামূর্তি দু'হাত বাড়িয়ে বিনয় সেনের গলা টিপে ধরলো।

কি ঠাণ্ডা, ঠিক্ যেন বরফের মত দু'খানা হাত। শিউরে উঠলেন বিনয় সেন, জীবিত মানুষের স্পর্শ এমন হিমশীতল হয়না। ঢোক গিলে বললেন বিনয় সেন—দাঁড়াও দাঁড়াও আমি দিচ্ছি--

দাও--

আলো না জ্বাললে কি করে দেবো?

বলো আমি বের করে নিচ্ছি। চাবি দাও।

চাবি! না, না, আমি —আমি দিচ্ছি--বিনয় সেন অন্ধকারে লৌহ আলমারী খুলে ফেললেন, হাতড়ে বের করলেন একটা ছোট্ট বাক্স।

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। খুদে বাক্সটা খুলে ফেললেন বিনয় সেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলাভ আলো উজ্জ্বল তারার মত চক্ চক্ করে উঠলো বিনয় সেনের হাতের মুঠায় ক্ষুদ্র বাক্সটার ভিতরে। বিনয় সেন বলে উঠলেন আপন মনেই—না, না, আমি এটা দেবো না-আমি এটা দেবো না--এটা হস্তগত করতে আমি শুধু তোমাকেই হত্যা করিনি, হত্যা করেছি বন্ধু এথোলকে, আমি হত্যা করেছি হুইসনকে---

এথোলকে কেন তুমি হত্যা করেছিলে?

এথোল জানতো এই অমূল্য রত্নটির কথা এবং সে জেনেছিলো আমিই ওটা নিয়েছি--তাই আমি ওকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আর হুইসন?

সে আমাকে ম্যাকমারা হত্যার দিন দেখেছিলো আলবার্ডের বাড়ির কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে। আমি—আমি মৃত্যুর হুমকি দেখিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলাম; কিন্তু হুইসন মৃত্যুর ভয়ে কয়েকদিন মুখ বন্ধ করে থাকলেও সে নিজকে আয়ত্বে রাখতে পারেনি, সে বলতে গিয়েছিলো ম্যাকমারার ভাবী জামাতা মিঃ আলমের কাছে।

তারপর?

আমি তাকে শেষ পর্যন্ত বলবার সুযোগ দিই নাই--

ছায়ামূর্তি বলে উঠলো —তুমি তাকে হত্যা করলে?

হ্যাঁ, আমি বাধ্য হলে হুইসনকে হত্যা করেছি। জানো ম্যাকমারা, শুধু এই রত্নটার লোভে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। পুলিশ কমিশনার হয়েও আমি এতো হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাই ওটা আমি ভিক্ষা চাই তোমার কাছে---

তা হয় না, ওটার জন্য তুমি একটি নয় তিন তিনটি খুন করেছো, এখন তোমাকেও হয়তো মরতে হবে--কাজেই ওটা আমার কাছেই থাক। ছায়ামূর্তি এক ঝটকায় বিনয় সেনের হাত থেকে কেড়ে নিলো উজ্জ্বল বস্তুসহ ক্ষুদে বাক্সটা। তারপর বললো—এবার তুমি নিশ্চিন্ত---

❑

কথা শেষ করে ছায়ামূর্তি বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

পুলিশ অফিসে মিঃ রাজেন্দ্রনাথ কাজ করছিলেন।

অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

এমন সময় পিয়ন একটা পার্সেল রেখে বললো—স্যার সই দিন।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ রিসিটে নাম সাইন করে পার্সেলটা মিঃ ভৌমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—খুলে দেখুন কি এলো।

মিঃ ভৌম পার্সেল খুলে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন—এযে দেখছি টেপ্ রেকর্ড!--

অফিসের সবাই ঘিরে ধরলো, ব্যাপার কি?

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ টেপ্‌রেকর্ডটা নেড়েচেড়ে সোজা করে রাখলেন, দেখলেন ফিতে ফিট্ করাই রয়েছে। তিনি আলগোছে চালু করে দিলেন টেপ্ রেকর্ড।

একি সবাই চমকে উঠলো—এযে মিঃ বিনয় সেনের গলা। স্তব্ধ হয়ে শুনছে পুলিশ অফিসারগণ।

কে--কে--কে তুমি--

চাপা অস্পষ্ট একটা কণ্ঠ --আমি ম্যাকমারার প্রেত আত্মা--

--এ্যাঁ কি বললে--

---আমি তোমার বন্ধুর আত্মা--

টেপরেকর্ডে বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো কথা নেই। পুলিশ অফিসের কক্ষ যেন নিস্তব্ধ মেরে গেছে। সবাই তাকাচ্ছে এ ওর মুখে।

আবার শব্দ ফুটলো—কি চাও তুমি আমার কাছে--

অদ্ভুত চাপা ফিস-ফিসে আওয়াজ--যা তুমি নিয়েছো আমার বুক থেকে ছিনিয়ে--

ভয়ার্ত চঞ্চল কণ্ঠ পুলিশ কমিশনারের --না, না, আমি তোমাকে দেবোনা---তুমি তো মরে গেছো, কি করবে ওটা নিয়ে--

--ফিসফিসে অস্ফুট কণ্ঠ--মরেও আমি স্বস্তি পাচ্ছিনে—তুমি আমাকে হত্যা করেছো--আমিও তোমাকে হত্যা করে আমার জিনিস ছিনিয়ে নেবো--

মিঃ রাজেন্দ্রের চোখে-মুখে কঠোর কর্তব্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। কঠিন হয়ে উঠছে তাঁর মুখমণ্ডল। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনছেন।

--আমি পুলিশ ডাকবো--

কমিশনারের গলা টেপ্ রেকর্ডে হলেও চিনতে ভুল হয় না পুলিশ ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথের।

ঠিক সেই মুহূর্তে টেবিলে ফোনটা সশব্দে বেজে উঠে টেপ্ রেকর্ড বন্ধ করে দিয়ে রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কানে ধরতেই বিবর্ণ হয়ে উঠে ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল—মিঃ সেন মৃত--

পুলিশ অফিসে যেন বাজ পড়লো।

রিসিভার রেখে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন মিঃ রাজেন্দ্রনাথ—সর্বনাশ হয়েছে, মিঃ ভৌম কমিশনার মিঃ সেনকে তাঁর কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

তখনকার মত টেপ্ রেকর্ড সাবধানে তুলে রেখে সবাই মিলে পুলিশ ভ্যানে ছুটলেন কমিশনার ভবনের দিকে।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার সহ কমিশনার ভবনে পৌছে তারা দেখলেন পুলিশ সুপার মিঃ বোস ব্যস্তভাবে পায়চারী করছেন। আরও অনেকে—কয়েকজন পুলিশ অফিসারও রয়েছে সেখানে।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টার, তিনি আসায় মিঃ বোস তাঁকে নিয়ে কমিশনার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

রাজেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অফিসারগণ বিস্ময়ভরা নয়নে দেখলেন—কমিশনার মিঃ সেন লৌহ আলমারীর পাশে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, স্থির আড়ষ্ট তার দেহ। চোখদুটো অর্ধমেলিত।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ মিঃ সেনের হাতখানা স্পর্শ করে বললেন—বহুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছেন।

পুলিশ সার্জন পরীক্ষা করে বললেন—হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মিঃ সেনের মৃত্যু ঘটেছে।

মিঃ বোস বলেন—কেউ তাঁকে হত্যা করেনি।

না। বললেন সার্জন।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ বললেন—মিঃ সেনের মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা অল্পক্ষণ পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হবো। কিছুক্ষণ পূর্বে পুলিশ অফিসে পাঠানো 'টেপরেকর্ড ব্যাপরটা' বললেন তিনি।

এবার সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন টেপরেকর্ড না শোনা পর্যন্ত সবাই উদ্বিগ্ন রইলো।

ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজার শব্দ শোনা গেলো। কলকাতা শহর সম্পুর্ণ সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েনি এখনও। তবে সন্ধ্যারাতের উচ্ছলতা নেই এখন। গাড়ি-ঘোড়া, যান-বাহন চলছে, কেমন যেন শিথিলতা এসেছে তাদের চলার মধ্যে।

দোকান-পাট গম গম না করলেও দুচারটে ষ্টল, হোটেল এখনও সরগরম করে বসে পান-বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছে ট্যাক্সিচালক, ট্রাম-বাসের কণ্ডাকটার আর কুলী-মজুরের দল। যারা সেদিনের শেষ উপার্জনের দুটো পয়সার আশায় এতোক্ষণও ছুটো ছুটি করে ফিরছিলো পয়সাওয়ালা বাবুদের পিছু পিছু তারাই এখন আসর জমিয়ে বসেছে।

রাত বেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত অবশ দেহটা নিয়ে একটু রস-রচনা সৃষ্টি করে চলেছে ওরা।

পথের দুধারের বাড়িগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে।

নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে বাড়ির মালিকগুলো তাদের ছেলে-মেয়ে বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে। গেটের পাহারাদার এতোক্ষণ ঝিমুচ্ছিলো টুলটায় বসে বসে, এবার সে দাঁড়িয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করেছে।

পার্ক সার্কসের মোড়ে বিরাট তিন তলা আলবার্ডের বাড়িটাও নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এতোদিন পর আজ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে আর্থার। তাই নিদ্রাটাও হয়েছে ঘন। আজ পুলিশ অফিস থেকে তাকে ডাকা হয়েছিলো এবং জানানো হয়েছে তার পিতা ম্যাকমারা হত্যা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁকে অচিরেই মুক্তি দেয়া হবে।

আর্থার আরও জেনেছিলো—ম্যাকমারা, এথোল এবং হুইসনকে একই ব্যক্তি হত্যা করেছে—তিনি হলেন বিনয় সেন। কিন্তু ম্যাকমারার প্রেত-

আত্মার বেশে কে তার ওখানে গিয়েছিলো যে হত্যাকারীকে আবিষ্কার করে তার পিতাকে নির্দোষ প্রমাণে সক্ষম হয়েছে—তবে কি সে আলম?

আর্থারের মনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছিলো আলমের সেদিনের কথাগুলো--তোমার পিতাকে নির্দোষ প্রমাণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন-- নিশ্চয়ই ম্যাকমারা কাকার প্রেত-আত্মারূপে বিনয় সেনকে খুনী প্রমাণে সক্ষম হয়েছে আলম। শ্রদ্ধাবনত হয়ে আসে আর্থারের মাথাটা।

এসব চিন্তা করতে করতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে আর্থার।

ওদিকের কক্ষে ঘুমিয়েছেন আর্থার জননী। অসুস্থ মানুষ তিনি, রাত জাগতে পারেন না মোটেই।

বাড়ির চাকর-বাকর সবাই ঘুমিয়ে।

এমন সময় শ্যালনের দরজার টোকা পড়লো।

শ্যালন আজ কিছুতেই ঘুমাতে পারেনি। যখন সে জানতে পেরেছিলো হুইসনের হত্যাকারী আলম নয়। তার বাবা আর এথোল কাকাকে যে খুন করেছিলো সেই খুন করেছিলো হুইসনকে এবং সে এখন জীবিত নয়—মৃত। আলম খুনী নয় সে নির্দোষ—নিষ্পাপ। শ্যালন আনন্দে আজ আত্মাহারা— আলমকে সে ভালবাসে। বিশ্বাস করে। সেও যে খুনী বলে স্বীকার করেনি কোনো দিন, প্রমাণ হলো সত্যি সে খুনী নয়--

হঠাৎ চমকে উঠে শ্যালন, একবার— দু'বার -তিনবার টোকা পড়লো দরজায়।

শ্যালন ভয় পেলো না আজ। একটা দুর্বার সাহস তাকে শয্যা থেকে ঠেলে দিলো যেন—শ্যালন দরজা খুলে দিতেই দেখলো। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আলম।

শ্যালন আনন্দধ্বনি করে উঠলো —তুমি!

বনহুর বললো—শ্যালন, চুপি চুপি আমার সঙ্গে চলে এসো খুব শীঘ্র করে।

তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ ভয় নেই, আবার পৌঁছে দেবো।

শ্যালন দরজাটা ভাল করে বন্ধ করলো, তারপর বললো—চলো।

আমার হাত ধরো শ্যালন। বাড়ির পিছনের সরু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যেতে হবে। ওদিকের রাস্তায় আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।

শ্যালন বনহুরের হাত ধরে তার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর ড্রাইভিং আসনের দরজা-খুলে বল্লো উঠে পড়ো।

শ্যালন গাড়িতে উঠে বসলো।

বনহুর ড্রাইভিং আসনে, ষ্টার্ট দিলো এবার।

শ্যালন বললো—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে?

তোমাকেও যদি হত্যা করি সেই ভয় হচ্ছে বুঝি?

আমাকে হত্যা করবে, বেশ তো করো।

সাবাস শ্যালন, তুমি নির্ভীক নারী। যা হোক তাহলে সত্যি ভয় পাওনি।

না মোটেই ভয় পাইনি। আলম, আমি সব শুনেছি।

কি শুনেছো?

হুইসনের হত্যাকারী তুমি নও। আমার বাবাকে যে হত্যা করেছে সেই হত্যা করেছে এথোল আর হুইসনকে।

এতো সংবাদ তুমি কোথায় পেলে শ্যালন?

আর্থার আমাকে বলেছে, আরও বলেছে—তুমিই নাকি তার বাবাকে সদ্য ফাঁসির মঞ্চ থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছো।

আমি! গাড়ির সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো বনহুর।

আলম, তুমি নিজেকে অমনভাবে গোপন রাখতে চাও কেন?

কারণ আমি দোষী।

শ্যালন হেসে উঠে—তোমার সব দোষ আমি জানি। আর্থার দাদার কাছে ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে গিয়েছিলে—এই তো! কিন্তু তার বাবার মঙ্গলের জন্যই তুমি ও কাজ করেছিলে তাও জানি।

গাড়ি তখন সোজা গঙ্গার দিকে ছুটে চলেছে।

শ্যালন বললো—একি এতো রাতে গঙ্গা তীরে কেন?

তোমার সঙ্গে একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে শ্যালন।

কি এমন কথা আলম? আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে। এতো রাতে গঙ্গার তীরে--

প্রথমেই বলেছি ভয় নেই।

কিন্তু---

কিন্তু নয় শ্যালন, কথা আছে।

গাড়ি নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছলো বনহুর আর শ্যালন।

বনহুর বললো—এবার নামতে হবে।

শ্যালন তাকালো চারদিকে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন গঙ্গাতীর। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে। সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে কেমন একটা উৎকট শব্দ। কোনো অশরীরী আত্মা যেন চলাফেরা করছে সেখানে।

শ্যালন বনহুরের কথা মত নেমে দাঁড়ালো।

একটা মিহশীতল হাওয়া শ্যালনের দেহে যেন কাঁপন ধরিয়ে দিলো। গভীর রাতে গঙ্গার হাওয়া বড় ঠাণ্ডা।

শ্যালন ভীষণভাবে ভয় পেয়েছে; কিন্তু কিছু বলতে পারছে না, মনে মনে ভাবছে—তাকে এভাবে গভীর রাতে নির্জন গঙ্গাতীরে নিয়ে আসার কি মানে হয়। তবে কি কোনো কু-অভিসন্ধি নিয়ে তাকে এখানে এনেছে আলম।

কিন্তু যাকে নাকি ভালবাসা যায়, বিশ্বাস করা যায়, তাকে নাকি ভয় পাওয়া যায় না। শ্যালন গঙ্গাতীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাবড়ে গেলেও আলমকে সে ভয় পেলো না। আলমের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো শ্যালন।

বনহুর হেসে বললো—শীত পাচ্ছে বুঝি?

হাঁ, বড্ড শীত।

বনহুর নিজের শরীর থেকে কোটটা খুলে শ্যালনের দেহে জড়িয়ে দিলো, তারপর ওর হাত ধরে নিয়ে গেলো একেবারে গঙ্গার ধারে।

শ্যালন বনহুরের হাতখানা আঁকড়ে ধরে রাখলো, একবার ভীত কণ্ঠে বললো—এখানে আমাকে কেন নিয়ে এলে আলম? আমার ভাল লাগছে না।

শ্যালন, এখনই ঘাবড়ে গেছো—কেন তোমাকে এখানে এনেছি জানলে আরও ঘাবড়ে যাবে।

কেন?

যদি বলি তোমাকে হত্যা করবো বলে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছি?

তুমি আমাকে হত্যা করবে?

হাঁ।

তাহলে এখানে কেন, আমার ঘরেই তো আমাকে হত্যা করতে পারতে?

হেসে উঠলো বনহুর—তাহলে বুঝতে পেরেছো—আমি তোমাকে এখানে হত্যার জন্য আনিনি। শ্যালন, তোমার বাবা কেন নিহত হয়েছেন জানো?

এখানে আমি ও কথা শুনতে চাইনে আলম।

তোমাকে শুনতে হবে।

না, আমাকে নিয়ে চলো।

কোথায়? আর্থারের বাসায়?

হ্যাঁ!

কিন্তু সে আশা তুমি ত্যাগ করো শ্যালন।

আলম! শ্যালন করুণ কণ্ঠে ডাকলো এবার। সত্যি সে দারুণ ভয় পেয়ে গেছে।

বনহুর পকেট থেকে বের করলো রিভলভার, চেপে ধরলো শ্যালনের বুকে—তোমাকে আমি খুন করবো।

আর্তনাদ করে উঠে শ্যালন—বাঁচাও বাঁচাও --

বনহুর অট্টহাসি হেসে উঠে—হাঃ হাঃ হাঃ এখানে গলা ফেটে চীৎকার করলেও কেউ জানবে না, কেউ সাড়া দেবে না। কারণ এটা শ্মাশানঘাট। নিমতলা শ্মশান--

শ্যালন ভুলে গেলো আলমের হাতে রিভলভার; ঝাপিয়ে পড়লো সে তার বুকে, কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

বনহুর বললো—শ্যালন, ভয় নেই। আমি তোমাকে হত্যা করতে আনিনি। এই নিমতলা শ্মশানঘাটে আজ তোমার পিতার হত্যাকারীর শেষ কৃত্ব সম্পন্ন হয়েছে।

উঃ কি ভয়ঙ্কর জায়গা।

এই ভয়ঙ্করের বুকে আজ সমর্পণ করবো তোমার পিতার হত্যা রহস্যের অমূল্য সম্পদ---বনহুর পকেট থেকে বের করলো একটি ছোট্ট ক্ষুদ্র বাক্স খুলে ফেললো সেটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা উজ্জ্বল নীলাভো আলো অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করে উঠলো।

শ্যালন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলো ভয় আর ভীতি, বললো—ওটা কি?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—এটাই লুকানো ছিলো তোমার বাবা ম্যাকমারার ছোট্ট জামার চোরা পকেটে। আর এটার জন্যই নিহত হয়েছেন তিনি। এথোল এবং হুইসন স্মিথও এর জন্য মৃত্যুবরণ করেছে। পুলিশ কমিশনার বিনয় সেন এটার লোভ সামলাতে পারলেন না তাঁরও মৃত্যু ঘটলো এই এটার জন্য--

আলম ওটা তুমি আমাকে দাও।

উঁ হু ওটা কারো জন্য নয়--বনহুর নীলাভো উজ্জ্বল বস্তুটাকে ছুড়ে ফেলে দিলো গঙ্গার বুকে।

শ্যালন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—এ কি করলে আলম!

হাঁ ওটা আমি গঙ্গার বুকে বিসর্জন দিলাম। কারণ ওটা যার কাছে থাকবে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

আলম, ওটা কি ছিলো?

ওর নাম মাণিক—সাত রাজার ধন।

শ্যালনের দু'চোখে বিস্ময়, অবাক গলায় বললো—মাণিক হাতে পেয়ে তুমি গঙ্গার জলে ফেলে দিলে?

হেসে বললো বনহুর—দস্যু বনহুরের কাছে সবই তুচ্ছ।

শ্যালন অন্ধকারে অবাক চোখে তাকালো, কণ্ঠ তার আড়ষ্ট হয়ে গেছে, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

পরবর্তী বই
বন্ধনহীন দস্যু বনহুর